রাজনীতির পাঁচন।
রামের হাসি চওড়া হয়
'সেকুলার'দের ধর্মচর্চায়

তবু ডুয়ার্স কেন
বিপুল ভোট দিল?

বড় গল্প। প্যাঁচা

থ্রিলার। যে শরীর ডাউনলোড হয়

উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

মে ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্ত্বা

৫ বছর পেরিয়ে

মে দিবস কি ঠিকানাহীন লক্ষ শ্রমজীবির খোঁজ রাখে?

যে মানুষগুলি সাত সকালে ঠিকে কাজে বেরোয় বা যে মানুষগুলি ঘর ছেড়ে বহুদূরে ঝুপড়িবাসী দিনমজুর কিংবা যে মানুষগুলি অনাহারী চা শ্রমিক পেটের দায়ে পাথর ভাঙ্গে কৈশোরে পা দেওয়া পুত্র কন্যাকে বেচে দেয়, ঐতিহাসিক মে দিবস শেষ কবে সেই সব মানুষগুলির খবরাখবর নিয়েছিল? বস্ত্র বিতরণের বাৎসরিক আতিশয্যে আমরাই বা কবে সুলুক সন্ধান করেছি ওদের?

এখন ডুয়ার্স **সম্পাদকের চিঠি**

পলিটিক্সের ওরা আমরা

কিছুদিনের বিরতির পর গত এক বছর ধরে আবার বাংলার বাইরে ভারত দর্শন শুরু করেছিলাম। কখনও বেড়ানো, কখনও কাজের অছিলায়। একে প্রাক নির্বাচনী কভারেজ বলা যায় না ঠিক! নির্বাচনের এক বছর আগে থেকে মানুষ কখনও ভোটের কথা ভাবে না। কিন্তু কেমন কাটছে তার দিনকাল সে আন্দাজ তো খানিক মেলে! হিমাচলের প্রত্যন্ত চাম্বা থেকে শুরু করে পঞ্জাব-পাকিস্থান সীমান্ত, দিল্লি বারাণসী থেকে ওড়িশার গঞ্জাম ভুবনেশ্বর, পুনে সোলাপুর হায়দরাবাদ এবং সবশেষে ঘরের পাশে নামনি আসাম। অনুদানের স্টেরয়েডে রঙীন কংক্রীট গ্রাম, সে গ্রামে রোজ বিকেলে গা ধুয়ে এসে হোয়াটসঅ্যাপে দেশান্তরী দিনমজুরের প্রতি ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে দেয় তার লাজুক নব্যবধূ। সে গ্রামে হাইওয়ের ধারে চাষের ক্ষেত বুজিয়ে গড়ে ওঠে সিটি মার্ট, প্রকাণ্ড বিলবোর্ডে ক্রিকেট কাপ্তান তার বলিউডি জানকে বগলে নিয়ে হাসিমুখ আমন্ত্রণ জানায় কোনও স্বপ্ন দুনিয়ায়! ঘর ছেড়ে মানুষ তাই ছুটছে, হরিপদ কেরাণিরা আজ সপরিবারে উবের উড়িয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকতে আর ভয় পায় না! তবু অবাক কাণ্ড, রাজনীতির কাছে মানুষের কোনও প্রত্যাশা নেই। রাজনীতিকে জীবিকা করবার তাগিদ নেই। মোটর বাইকে ঝড় তুলে নতুন প্রজন্ম তো রাজনীতির লোকেদের নিয়ে খিল্লি ওড়ায়, জানে এদের আর যাই থাক চাকরি দেওয়ার খ্যামতা নাই, 'সব ঢোঁড়া ঢ্যামনার দল ভোট এলেই প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেয়'।

বাংলায় ফিরে এলে কি সে সব হিসেব বদলে যায়? এখানে কি হিসেব নেওয়া হয় 'ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে'? এখানকার তার্কিক নির্বাচকের দল সকাল সন্ধ্যায় মোড়ে মোড়ে জটলা করে। কেন আমরা ওদের পক্ষে যাব? "না এদের মাসলম্যানেদের বড্ড বাড় বেড়েছে!" কেন আমরা এদের ভোট দেব? "না ওরা মুসলমানেদের বড্ড তেল দেয়!" কেন আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই? "না রাজ্য বাহিনী থাকলে অবাধে ভোট সম্ভব নয়!" কেন মোদি-দিদির এত ঝগড়া? "আসলে মোদির প্রব্লেম তাঁর দিদিকে নিয়ে নয়, প্রব্লেম ভাইপোর পিসিকে নিয়ে!" ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে নিজেদের রোজগার, নিজেদের সমাজ, নিজেদের সন্তানের ভবিষ্যৎ কাল কোথায় দাঁড়াবে সে নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই আমাদের, মনে মনে কখন যে ভোটপ্রার্থীর টেনশন নিজেরা নিয়ে ফেলি তা মালুম হয় না! কোনও অক্ষম ক্ষোভে ভাইরাল করি নেতাদের ভ্রান্তির ভিডিও। বাজার ফাঁকা, প্যাসেঞ্জার খুঁজে খুঁজে হয়রান টোটো, দপ্তরে দপ্তরে সাহেবের খালি চেয়ার আর এমাথা ওমাথা থেকে ঘন ঘন হাই ওঠে। এগারোই এপ্রিল থেকে বাইশ মে— এত দীর্ঘকাল টানটান স্নায়ু নিয়ে বসে থাকাই যে দায়!

তবু বুক বাঁধি— এইবার! এইবার বুঝিবা চায়ের শ্রমিক হেসে উঠবে, এইবার বুঝি আদিবাসি রমণির ঘাগড়ায় নাচের হিল্লোল উঠবে আবার! এইবার বুঝি রোজ সকালে পাখি বিমানের টেক অফ দেখবে কোচবিহারের আকাশ, এইবার বুঝি আমরা দলবেঁধে গিতালদহ সীমান্ত সেতু দিয়ে হই হই হেঁটে যাব ওপারের উত্তর বাংলায়! এইবার বুঝি দত্যিদানোরা ঢোলবাদ্যি সহযোগে পগার পার হবে, এইবার বুঝিবা পাড়ায় পাড়ায় বেজে উঠবে মঙ্গল শাঁখ!

দেখুন দিকি, ইলেকশনের নামচা পড়ে পড়ে কবে যে নিজেই জনবর্জিত রাজনীতির একজন হয়ে যাই টেরই পাই না! সবাইকে নিয়ে ভাল থাকার চেষ্টা করবেন।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি	
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড	৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির	
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার	৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি	
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে	৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার	
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)	৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা	
দিলীপ সরকার, চালসা মোড়	৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি	
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল	৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া	
বরুন ঘোষ, পোকিসা	৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট	
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি)	৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি	
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)	৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি	
দেবাশিষ বসুভাট	৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা	
অমল চন্দ্র পাল	৯৪৩৪৪১২৬৪৯
তুফানগঞ্জ	
আনন্দবাজার বুক স্টল	৯৩৩৩৬৮৮৬৭১
দিনহাটা	
হরিপদ রায়	৯৯৩২৬৩৯০৬৮
আলিপুরদুয়ার	
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট	৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার	
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে	৯৪৩৪২১৭০৮৪
মালদা	
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি	৯৯৩২৯৬৭৯৯১
বালুরঘাট	
মাধববাবু	৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন	৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমন্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে। জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে

editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা

পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন
জঙ্গল | জনসত্ত্বা
শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ২

রাজনীতির পাঁচন
রামের হাসি চওড়া হয় 'সেকুলার'দের ধর্মচর্চায়! ৭

প্রবাসীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ
আঙুর ফল টক ১০

প্রচ্ছদ নিবন্ধ
মে দিবস কি ঠিকানাহীন লক্ষ শ্রমজীবির খোঁজ রাখে? ১১

এখন ডুয়ার্স পরিক্রমা
তবু বিপুল ভোট দিল ডুয়ার্স কীসের আশায়? ১৪

উত্তরপক্ষ
সাপুড়েরা সব হারিয়ে গিয়েছে দিনমজুরের দলে ১৮

ডুয়ার্স থেকে দূরে নয়
লজ্জাবতী পাহাড়ি গাঁ ২০

শ্রীমতি ডুয়ার্স
রাজনীতিতে ভাষা সন্ত্রাসের শিকার সেই নারীই! ২৩

দেবযানী। এক পরাজিত প্রেমিকা ও স্ত্রী ২৫

আমার মেয়েবেলা ৩৭

গল্প
প্যাঁচা ২৬

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
মহারাণী কথা ৩০

যে শরীর ডাউনলোড হয় ৩৩

নিয়মিত বিভাগ
ফেসবুক পোস্ট ৪, খুচরো ৬, রাসায়নিক রস ৩৮

সেরা পোস্ট

সেরা পোস্ট

বুবুন চট্টোপাধ্যায়
Bubun Chattopadhyay

৮ এপ্রিল, ২০১৯

এবারে বেশ কালবৈশাখী হচ্ছে। আজও পূর্বাভাস আর কিছুক্ষণ পর ধেয়ে আসছে ঝড়। কালবৈশাখী হলেই আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। জন্ম থেকে শহরেই বাস। তাই ঝড়ের দোলায় নারকেল গাছের কাঁপন দেখিনি। কালবৈশাখী হলেই প্রায়শই বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যেতো। আর সারা তল্লাট জুড়ে ঝুপ করে অন্ধকার নেমে পড়তো। আমি নিয়ম করে বিকেলবেলা খেলতে বেরোতাম। মা বারান্দা থেকে ডাকতো, বুবুন.....

বাড়ি আয়। ঝড় আসছে। আমি সহজে আসতাম না। ঝড়ের ওই ধুলোর গন্ধটা আশ্চর্য ভালো লাগতো। প্রাণ ভরে ওই ধুলোটা নিয়ে নিতাম সর্বাঙ্গে। মা ডাকলে বলতাম, দাঁড়াও, সিএসসি র কাকুরা এসছে কিনা দেখি। কারণ তখন প্রায়শ ই নানা কারণে লোডশেডিং হতো। আর আমাদের ছোটোদের কাজ ছিল টেম্পো চড়ে মই নিয়ে সিএসসি র কাকুরা এসেছে কি না দেখা। এইজন্য আমি জ্যোতিবাবুকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না। তিনি আশৈশব আমার লোডশেডিং এর রোমান্টাকিতার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। আসলে আমি যেতাম একটু দূরে ধুলোর গন্ধ শুঁকতে। কারেন্ট এলো না তো বয়ে যেতো আমার। ওই তীব্র ঝড়ের মুখে ধুলোয়, ধুলোয় আমি মনখারাপ কুড়োতে যেতাম। আমাদের তো আম কুড়োনো শৈশব ছিল না। ইট, কাঠ, কারেন্ট, আইসক্রিমওয়ালা, হজমিয়ালার সঙ্গে মিলেমিশে একটা অদ্ভুত শৈশব ছিল। সেই শৈশবে হ্যারিকেনের আলো থাকলেও আম গাছ ছিল না, নারকোল গাছ ছিল না, পুকুরপাড় ছিল না। প্রবল হাওয়ায় জোনাকিরদের উড়ে যাওয়া ছিল না। আমি সেইসব না পাওয়াগুলো খুঁজতে যেতাম পাড়ায়, পাড়ায়। এমন কালবৈশাখীর দিনে।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়
Arjun Bandyopadhyay

৩ এপ্রিল, ১০.২৫ AM-এ

কবিদের কথা জানি না, তবে গদ্যকাররা একটু আধটু বার খেতে ভালোবাসেন। আসলে, প্রচুর খাটনির কাজ। বার-টার খেলে ফুসফুসে অক্সিজেন পাওয়া যায়। উদ্যম আসে। যদি আমার গদ্য, গল্প, উপন্যাস আপনার ভালো লাগে, যদি চান আরও লিখি, তাহলে আমায় বার খাওয়ান। রবি থেকে শনি যে কোনো বারেই খাওয়ানো যায়। এটা নিয়ে কোনও ভণিতা না রাখাই ভালো। কারণ আমি বারভণিতা নই।

নিজেকে দিয়ে বুঝি, আর কিছু না হোক গদ্যকারদের ক্ষেত্রে বার খুবই কার্যকরী। নইলে প্লট, চরিত্র, কাহিনি, তার নানান লেয়ার, সব সাজিয়ে, সুতো গেঁথে গেঁথে, উল বুনে বুনে, এ ফোঁড় ও ফোঁড় সুচ ঢুকিয়ে সেলাই করে করে কয়েকশো পাতা টানা দিনের পর দিন লেখার ও তার ঘোর বহিবার শক্তি, উদ্যম, মেজাজ কিছুই পাওয়া যায় না। বার না খেলে, এসব কিছুই না করে আমি চাদরটা টেনে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি। কতবার পড়েওছি হায়, শুধু পর্যাপ্ত বার পেলাম না বলে।

শামিমা আকতার মুক্তা
Shamima Akter Mukta

৫ এপ্রিল, ৮.৪৯ AM-এ

সংগীত কলেজে তখন বি. মিউজিক এ পড়ছিলাম। কলেজের গাছের আম চুরি করে খেয়েছিলাম একদিন। পরের দিন ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাডাম ডেকে পাঠালেন! বুক ধুক ধুক করছিল এবার নিশ্চই কলেজ থেকে বের করে দেবেন! ম্যাডামের হাতে একটি পেপার সেই পেপারে আমার ছবি! ছবিটা দেখিয়ে ম্যাডাম আমাকে বললেন শামীমা এটা কী তুমি? আমি বললাম জি ম্যাডাম আমি! সহজ ডট কমের একটা বিজ্ঞাপন করেছিলাম। পেপারে আমার ছবি ছেপেছে ঐই কোম্পানি। ম্যাডাম আমাকে আশির্বাদ করে বললেন বাহ অনেক বড় হও! মান সম্মান বাঁচলো আম চুরির ঘটনাটা ম্যাডাম এখনো জানেন না!

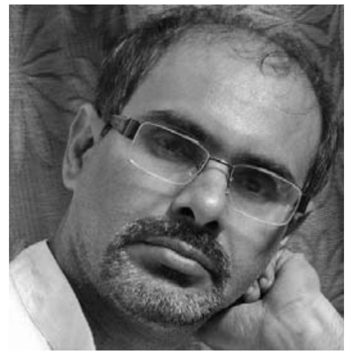

রূপক সান্যাল
Roopak Saanyal

১২ এপ্রিল, ৮.৩৬ PM-এ

কোন একদিন তোমার মনে হতেই পারে যে, তুমি মস্ত বড় কেউ একজন। মনে হতেই পারে যে, তুমিই সবচেয়ে ক্ষমতাবান, তুমিই বীরশ্রেষ্ঠ, তুমিই সর্বের সর্বাধিনায়ক। মনে হতেই পারে, তোমার উদ্ধত তর্জনীকে ঘিরে আছে এক অদৃশ্য সুদর্শন চক্র। কিংবা তোমার মুষ্ঠিবদ্ধ হাতকে মনে হতে পারে বজ্রের মত কঠিন। এরকম মনে হয় অনেক সময়, মনে হতেই পারে।

এরকম মনে হলে চিন্তা কোর না, আসলে এটা একটা অসুখ, ঠিকঠাক চিকিৎসা করালে নিশ্চই ভালো হয়ে যাবে। তোমার জন্য সমবেদনা রইলো।

কোন একদিন তোমার মনে হতেই পারে যে, তুমিই রাজাধিরাজ, তুমিই অধীশ্বর কিংবা তুমিই শেষ কথা। এরকম মনে হতেই পারে যে, তুমিই সমগ্র মনুষ্যজাতির ত্রাতা। কখনো তোমার এরকম মনে হতে পারে যে, সমস্ত দেব-দেবী-দানব তোমার করতলে বন্দী, তুমিই স্বর্গ, তুমিই চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার নিয়ন্ত্রক।

যদি কখনো এরকম মনে হয়, তাহলে দুশ্চিন্তা কোর না, আসলে এটা একটা অসুখ, ঠিকমত চিকিৎসা করালে অবশ্যই ভালো হয়ে যাবে। তোমার জন্য সমবেদনা রইলো।

একটা কথা মনে রেখ, পৃথিবীর বহু মানুষের এরকম অসুখ করেছিল। ঠিকঠাক চিকিৎসা হয়েছিল বলেই আজ তারা সবাই শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। তাদের তর্জনী আর উদ্ধত হয় না, তাদের হাত আর মুষ্ঠিবদ্ধ হয় না, তারা আজ আর নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করতে পারে না। তারা এখন ভিড়ের মধ্যে গোড়ালি উঁচু করে পরবর্তী বাঁদরের খেলাগুলো দেখে আর হাসে, আর মনে মনে বলে, এসবই আসলে অসুখ, ঠিকঠাক চিকিৎসা করালে সবই সেরে যায় একদিন।

সেরা পোস্ট

শৌভিক রায়
Sauvik Roy
১২ এপ্রিল, ১১.৩৫ AM-এ

পর্ব শেষে

পর্ব শেষে বিদায় জানাবার সময় যখন এক সুঠাম দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে হরিয়ানার দৃঢ় চেহারার এক জাঠ, কেরালার এক সদা হাস্যময় মালয়ালি ও দক্ষিণবঙ্গের এক দুরন্ত বাঙালি, এক নগণ্য শৌভিক রায়কে “আপকো মিস করেঙ্গে” বলেন তখন আর্দ্র হই।

সেই আর্দ্রতা বেড়ে যায় আবারও। কানে আসে, “রায়দা একবার অবসর করি আসিয়া ঘুরিয়া যান”। মিলিয়ে যাওয়া অবধি হাত নেড়ে চলেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ইব্রাহিম-কেশব-সুবল।

মনে হয় সত্যি বড্ড বিচিত্র এই দেশ!

হয়তো অনেকের মনে হবে শুধুমাত্র কর্তব্যের খাতিরে এই সম্পর্ক। কিন্তু কেন যেন মনে হয় শুধুই কি কর্তব্য? তাহলে বিদায়বেলায় ওই কথাগুলি কি আসতো? পর্ব মিটে যাওয়ার এতক্ষণ পরেও কি ওদের কথা আমার নিজের মনে থাকতো?

প ব পুলিশের ওই দুই ভদ্রলোক বা দু'ঘণ্টা বাদে বাদে টহল দিতে থাকা সীমান্তরক্ষীরাও কি কম ভুলে যাবার মতো? কিংবা দীপালির নেতৃত্বের সেলফ হেল্প গ্রুপ? পরম যত্নে দূর থেকে খাওয়ার টেনে এনে খাওয়ালেন তো তারাই। পয়সার বিনিময়ে ওদের এই কাজের মূল্যায়ন করব এতটাও অমানুষ নই (বহুবার বহুভাবে প্রতারিত হয়েছি এটা মাথায় রেখেও বলছি)।

মনে পড়ছে এলাকাবাসীদের কথা যাঁদের কাছে বোধহয় একটা দায় ছিল এটা বোঝানোর যে কোনো একবারের লেগে যাওয়া দাগ তারা মুছে ফেলতে ব্যগ্র (মনেপ্রাণে চাইছি অতি দ্রুত মুছে ফেলুন তারা সে দাগ)।

বাকি রইল সেক্টরের আধিকারিক ও ডিসিআরসি-এর কর্মীরা। তাদের কিছু করার নেই। গাল খানও, গাল দেনও... তাই কাটাকাটি বা থুক্কুমুক্কু।

বাদ পড়ছেন না বাস-চালক ও তার সহকারী। তারাও তো সঙ্গী দু'দিনের! রিলিজ নিতে এসে তাদের মুখেও তো হাসি যাতে লুকোনো ছুটির আনন্দ আর আবার দেখা হওয়ার প্রত্যাশা!

শেষবেলায় হাসি আর বেদনা আমার তিন সঙ্গীর চোখে-মুখেও। পরমাত্মীয় বিচ্ছেদের সময় বোধহয় মানুষ এরকমই হাসে!!

(ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জায়গীর বালাবাড়ী... স্থানীয়রা জানালেন সীমান্তের শেষ ভোটদানকেন্দ্র এটি। সত্যতা যাচাই করি নি।

আসলে শেষ বলে কিছু হয় না। শেষ মানেই শুরু। টি এস এলিয়টের বিখ্যাত সেই বাক্যের দুটি শব্দকে একটু স্থান পরিবর্তন করে বলি— In my end is my beginning...)

অনির্বাণ নাগ
Anirban Nag
১২ এপ্রিল, ৭.২৩ PM-এ

ডিসি থেকে মালপত্র নিয়ে এবং সাথে একবুক আশংকা নিয়ে পৌছলাম বুথে। স্কুলে বলে গেছি, না ফিরলে অন্তত দশ মিনিট নীরবতা পালনের পর সেভেন্থ পিরিয়ড অবধি ক্লাস চালাতে হবে, যাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সবাই গালি দিয়েও যেন আমার নাম নেয়। ডিসিতে দেখে নিয়েছিলাম আমার বুথে SAP ট্যাগ করা আছে। মানে State Armed Police. কিন্তু গিয়ে দেখি বি এস এফের চার রাইফেলধারী জওয়ান আগে থেকেই সেখানে হাজির। 'নমস্তে স্যার...' বলে জওয়ানদের হেড আলাপ শুরু করলেন। কিন্তু আমার হিন্দী বচনের দক্ষতা তো ঐ প্রতিটি কথার পিছনে একটা করে 'হ্যায়'লাগিয়ে দেওয়া। হেড আর বেশি রিস্ক নিলেন না। তবে কথাবার্তায় যেটুকু বুঝলাম, উনি এলাকার বিধায়ক এলেও বুথের ভিতরে ঢুকতে দেবেন না, যদি ভোটার না হন। সন্ধে নেমে আসার আগেই হাজির সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপের মহিলারা। 'দাদাভাই, রাতে কী খাবেন বলুন।' আমি ডিম্ভাতের পক্ষে। প্রিসাইডিং-এর কথা সকলে মেনে নিল ঠিকই, কিন্তু শর্ত একটাহ— ডিম্ভাতই যদি খাবো, তবে হাঁসের ডিম লাগবে। রান্নার মহিলাদের হেড যিনি, তিনি বললেন— 'যাই দেখি বাজারে, পাই কিনা...' ওনার দুই ছেলে। একজন ইংলিশ অনার্স নিয়ে কলেজে পড়ছে। আরেক জন প্লেন বি এ। তবে বাজারে যাওয়ার আগে দাদাভাইদের জন্য পেঁয়াজ, তেল, লংকা দিয়ে একথালা ভর্তি মুড়িমাখা চলে এল এবং তারপর গরম চা। রাতের কাজকর্ম গুছিয়ে নিয়ে রাত সাড়ে নটায় খেতে বসলাম সবাই। মুসুরির ডাল সহযোগে আলুভাজা আর হাঁসের ডিমের গা মাখা মাখা ঝোল। আমি সাধারণত দুবার ভাত নিই না। কিন্তু সেল্ফ হেল্ফ গ্রপের বোনেদের ধমকে দুবার নিতে হল। থালায় বাড়া ভাত ফেলে নাকি উঠে যেতে নেই। এবার ঘুমনোর তোড়জোড়। সকাল সকাল উঠে মকপোল শুরু করতে হবে। খুব ভোরেই হাজির দুই পার্টির এজেন্ট। তৃণমূলের কমলদা (লাল জামা) আর বামেদের সৌম্যদীপ (আমার ডান দিকে)। নিপাট ভালোমানুষ কমলদার স্কুলে স্কুলে সাইন্স ল্যাবের সরঞ্জাম সাপ্লাই-এর বিজনেস। কমলদার দুই ছেলে। একজন বাইরে থাকে, আরেক জন মাস্টার্স করে বি এড করছে। আর সৌম্যদীপ পার্টির হোলটাইমার, দিল্লীতে থাকে। কথায় কথায় বেরিয়ে এল সৌম্যদীপের বাবা এই কেন্দ্রের এক্স এমএলএ এবং আমার পিতৃদেবের রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। সকাল ১০টায় কাঁঠালের তরকারী দিয়ে রুটি আর দুপুরে লাউ শাক আর বাটা মাছের পাতলা ঝোলের সাথে উপরি পাওনা ছিল খাবার পরিবেশনে মাটির গন্ধ মাখা আন্তরিকতা। পার্টির পোলিং এজেন্টরা, রান্নার মহিলারা যে কখন আমাদের ভোটকর্মী পরিবারের সদস্য হয়ে গেলেন, টেরই পেলাম না। একসংগে চা, মুড়ি খেতে খেতে খোশগল্প আর ভোটার এলে ভোটপর্ব পরিচালনা করা— এই রাজনৈতিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেন এক রুপোলী রেখা। শত্রুতা? সে তো রাজনৈতিক। ব্যক্তিগত সম্পর্কে তার ছায়া পড়বে কেন ? এই প্রশ্ন তো আমাদের সকলের। কিন্তু উত্তরটা বোধহয় জানে রাজনৈতিক দলের এই সাধারণ কর্মীরা। রাজনীতি থাকুক না তার নিজস্ব জগতে। কিন্তু তার বাইরেও তো একটা জীবন আছে। সেই জীবন তো নদীর মতোই বয়ে চলেছে উৎস থেকে মোহনায়, মিশে যায় মহাঅনন্তে। সেই জীবননদীর বালুকাবেলায় দাঁড়িয়ে রাজনীতির নেতারা, আপনারা শুনতে চেষ্টা করুন সেই ধারাস্রোতের ধ্বনি যেখানে ধুয়ে যায় সব মলিনতা, সব পাঁক।

ঘরে বসে নিয়মিত
'এখন ডুয়ার্স' পেতে চান?

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার গ্রাহক নেওয়া আপাতত বন্ধ আছে। তার মূল কারণ, ডেলিভারিতে কুরিয়র সার্ভিসের আন্তরিকতার অভাব। যে টাকার বিনিময়ে ওঁরা পত্রিকা পৌঁছনর দায়িত্ব নেন তাতে আজকের বাজারে সেই আন্তরিকতা আশা করাও অন্যায়। কুরিয়র চার্জ পত্রিকা সংখ্যাপ্রতি গড়ে ৬০-৭০ টাকা হলে ডেলিভারি মোটামুটি নিশ্চিত করা যায়। ফলে এক বছরের গ্রাহক চাঁদা গিয়ে দাঁড়ায় ১০০০ টাকা। বেশির ভাগ গ্রাহকের পক্ষে এই অঙ্ক একবারে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এবার থেকে প্রতি ৬ মাসের গ্রাহক চাঁদা ধরা হয়েছে ৫০০টাকা। শর্ত একটাই, গ্রাহকের ঠিকানা কুরিয়র নেটওয়ার্কে থাকা চাই। এবার থেকে যদি নিয়মিত ঘরে বসে 'এখন ডুয়ার্স' পেতে চান তবে নাম-ঠিকানা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান ৬২৯৭৭৩১১৮৮ এই নম্বরে।

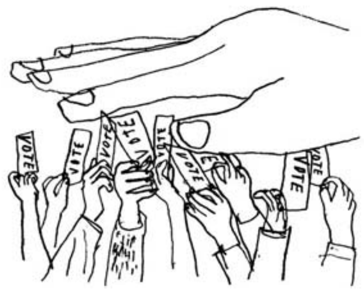

ভোটারজান

বেশ কিছু ওয়ান শটার আর বোমা কিনিয়া রাখিয়াছিলাম ভোটের আগে বুথ দখলকারিদের বেচিব বলিয়া। ভাবিয়াছিলাম মোটা দাঁও মারিব। কিন্তু খুব একটা সন্ত্রাস হইল না। শুরুতে অবশ্য কোচদেশের সূর্যবাবু একটু আশা জাগাইয়াছিলেন। তারপর পুরা ফ্লপ। ডুয়ার্সে ঠান্ডা ঠান্ডা, হিম হিম ভোট দেখিয়া ভাবিলাম, ব্যবসা পাইলাম না! খাব কী? তখন কলিকা সমিতির স্বঘোষিত সাধারণ সম্পাদক কহিলেন, চাপ নিতেছেন কেন? ফল বাহির হইলেই যুদ্ধ বাঁধিবে। তখন বোমার ভাল দাম পাইবেন। ওয়ান শটার ব্ল্যাক হইবে। শুনিলাম ভোটারগণ নাকি টারজানের মত লম্ফ দিয়া কাস্তে-হাতুড়ি ত্যাজিয়া ধুপধাপ শতদলে যাইয়া পড়িতেছে। ফল প্রকাশ পাইলে দেখিবেন ঘাস নাই। মাঠ পুরা ন্যাড়া আর গেরুয়া। তখন গন্ডগোল না লাগিয়া উপায় কী? আর যদি মাঠ সবুজই থাকে তবেও ক্ষতি নাই। তখন তো আর কেন্দ্রিয় ফৌজ থাকিবে না। বোমা বিক্রি আটকায় কে?

বানর বা নর

নরঃ-নরৌ-নরাঃ হয়, কিন্তু বানরঃ-বানরৌ-বানরাঃ হয় কি না জানা নাই। এমনিতে জলপাইগুড়ির সুপার স্পেশালিটি আরোগ্যনিকেতন দেখিতে মন্দ নয়। চিকিৎসক ছাড়া সবই সুপার মানের। অবশ্য চিকিৎসকের মত এক-আধটা অভাব লইয়া বিরোধিরা চিৎকার করে ঠিকই, কিন্তু সব কি সবখানে থাকে রে ভাই? নরঃ-নরৌ-নরাঃ কি সেখানে চিকিৎসে করাতে ভর্তি হয় না? তবে ক-দিন হইল সুপারারোগ্যনিকেতনের গবাক্ষগুলি বন্ধ দেখিয়া ভাবিলাম গোপনে ডাক্তার আনিয়া অপারেশন করিতেছে। পরে জানিলাম ব্যাপার অন্য। ডুয়ার্সে নাকি দুমদাম শব্দে পদ্ম ফোটা নিশ্চিত। এই মহালগ্নের অগ্রদূত

তাই টাউনে হাজির হইয়াছেন। তবে তিনি ভুল করিয়া সুপার হাসপাতালে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন কয় দিন যাবৎ। অগ্রদূত একজন বানর। তিনি ঝড়ের বেগে একতলা-দশতলা করিয়া কী জানি খুঁজিতেছেন। বোধহয় রাম খুঁজিতেছেন। টাউনে তো দশতলা বাড়ি আর নাই। বানরমুনি হয় তো উহাকে ভুল করিয়া মন্দির ভাবিয়াছেন। তাই দ্বার-গবাক্ষ সব বন্ধ। পাছে ঢুকিয়া পড়ে। এইসব ভাবিয়াই কি কবি লিখিয়াছিলেন— দ্বার বন্ধ করি দিয়া হনুটারে রুখি/ রোগি ভাবে আমি তবে কোথা দিয়া ঢুকি?

শুঁড়েলা তোলা

আমার গুরুদেব ক্যানাবিসানন্দ স্বামী বলিতেন, 'দ্যাখ পাগল! তোলা আদায় করিবার ব্যাপারে শাসকদল আর

হাতির মধ্যে ফারাক আছে। হাতি তোলা তুলিয়া সেইখানেই হজম করিয়া ফেলে। মনে কর তুমি বাজার হইতে মাস পয়লায় আশি পাউন্ড চাউল আনিয়া রাখিলে। হাতি আসিয়া রান্নাঘর ভাঙিয়া চাল খাইয়া গেল। তারপর ধর ক্ষেতে ফসল ফলাইয়াছ— আসিয়া খাইয়া গেল।' ভাবিয়াছিলাম গুরুবাক্য অব্যর্থ। কিন্তু যেই রূপে হস্তির মানবায়ণ ঘটিতেছে তাহাতে গুরুবাক্য ফল্‌স্ হইয়া যায় যায়। নাগ্রাকাটায় সেই দিন হাতি আসিয়া গেরস্তের ভাঁড়ার হইতে দুই বস্তা চাউল বাহির করিল বটে, কিন্তু খাইল এক বস্তা!! দ্বিতীয় বস্তা শুঁড়ে তুলিয়া চলিয়া গেল বনে!!! ঠিক যেন মানবপুত্রের আদায় করা তোলা যাহা পকেটে পুরিয়া তোলাবাজ ঘরে ফিরিয়া যায়! হাতি কি তবে তোলা জমাইতেছে? ব্ল্যাক তোলা? কী কান্ড! হাতিরও কি ব্ল্যাক মানি জমিবে? যদি জমে তবে সুইস ব্যাঙ্ক কোথায় হইবে? হাতিদের প্রধান কি কালা চাউল সাদা জব্দ করিবার জন্য ডিচাউলাইজেশন করিবে? অবিলম্বে নাগ্রাকাটার সেই হাতিকে (যাহারা সংখ্যায় ছিল তিন) জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।

গুজবাকুসুম

সমিতির সদস্য দারোগা বসুনিয়া সেদিন বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠপুরের কোটাল নাকি নতুন একখানা স্কিম লঞ্চ করিতেছেন। ইহাতে থানার কিছু আয় বাড়িবে।' শুনিয়া আগ্রহ পাইলাম। কিন্তু স্কিম শুনিয়া প্রায় খাবি খাই। ব্যাপারটা এইরূপ। "পুজোর ক-টা দিন লক আপে থাকুন"— ইহা প্রজেক্টের নাম। ঘণ্টায় পাঁচশো টাকা খর্চা দিলে লক আপে যে কেউ থাকতে পারবে। পুজোর সময় থাকিলে খর্চা অবশ্য ডাবল। অপরাধি হইলে ফ্রি। ভাবিলাম, ভোটের ধকল পুরাপুরি কাটে নাই। তখন বসুনিয়া কহিল, সেদিনও একজন থানায় আসিয়া স্বেচ্ছায় লক আপে থাকিতে চাহিয়াছে। বাড়িতে তাহার বড়ই অশান্তি। লক আপ-ই একমাত্র শান্তিস্থান। এইরকম নাকি মাঝে মাঝেই আসে। তাই এই স্কিম। এইবার বাহবা দিলাম! দরকারে এসি লক আপ বানাইতে হইবে, কিন্তু স্কিম মোক্ষম!

পদ্মসমগ্র

জটিলেশ্বরে পদ্ম ভালই ফুটিতেছিল কিন্তু এখন নাকি হাওয়া হইয়া যাইতেছে। না না! শাসক দলের সন্ত্রাসের কারণে বা বুথ দখলের জন্য পদ্ম কমিতেছে না। ইহা ননপলিটিকাল পদ্ম। জটিলেশ্বর মন্দির লাগোয়া দীঘিতে ফুটিয়া থাকে। ভক্তের দল তাহা জটিলেশ্বরকে নিবেদন করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। দীঘির পদ্মই ভ্যানিশ হইতেছে। সরোবর লিজ লইয়া কে জানি মৎস্যের স্বার্থরক্ষায় আগাছানাশক প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উহাতে আগাছার ন্যায় পদ্মও গায়েব। গেরুয়া শিবিরের পতাকায় পদ্মের অভাব নাই— কিন্তু পতাকা হইতে পদ্ম খুলিয়া কী ভাবে জটিলেশ্বরকে দিব? সরোবরে পদ্মহত্যা থামাইবার জন্য তাই ভক্তজনেরা আন্দোলনের কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু সরোবর যিনি লিজ লইয়াছেন তাঁহার সাফ কথা, মৎস্যদের নিরাপত্তার কারণে তিনি আগাছানাশক ঢালিয়াছেন। শুনিয়া এলাকার পদ্মনেতা রাগ করিয়া কহিয়াছেন, 'আমরা বুঝি আগাছা?' পরিবেশবিদ কহিয়াছেন, আগাছানাশক সরোবরের মহা ক্ষতি করিবে। কিন্তু তাহাদের কথা কে শুনে! শাসক দল কিছু কহিতেছে না কারণ তল্লাটে ভোট ফুরাইয়াছে। ফল প্রকাশ হইলে যদি পদ্ম অটোমেটিকালি ফুটিয়া যায় তবে আর চাপ লইয়া লাভ কী?

বিজ্ঞপ্তি

কবিদের প্রতি অনুরোধ— এই পত্রিকায় কেবল মহাকবিদের রচনা প্রকাশিত হয় যেমন কবিপ্রবর পুরন্দর ভাট। তাই কবিতা না পাঠাইয়া পুরন্দরবাবুর কিছু অপ্রকাশিত কবিতা পড়া যাউক। তিব্বত হইতে এগুলি পাঠাইয়াছেন জনৈক ঝিক ঝিক লামা।

১) বুকে বড়ো বাজে ব্যথা টন টন টন/ ক্রান্তিতে খুন হল দুটি বাইসন।

২) হেরিয়া অবাক হয়ে যাই/ গুরুংজি কহিয়াছে ঘিসিংকে 'ভাই'।

৩) আমবাড়ি বটতলা, এক পাইথন/ রেলপথে গলা দিয়া দুই পিস হন।

৪) শিলিগুড়ি জুড়ে নাকি ধোঁয়া আর স্মোক/ দূষণের ছবি তুলে পোস্ট করে লোক।

৫) কোচদেশে শুওরের ব্লাড টেস্ট হবে/ মশকবাহিত রোগ থাকবে না তবে।

৬) মহাসড়কের ঠ্যালায়/ দশটার বাস ঢুকিসে দেখিল/ বারোটে দশে অ্যালায়।

বিঃদ্রঃ খুচরার বিষয়বস্তুর সহিত বাস্তবের মিল পাইলে দোষ বাস্তবের। আর, কোথায় জানি বোতাম টিপিতে জনৈক মাতাল ভোটারের দশ মিনিট লাগিয়াছিল শুনিয়াছি। উহা কোনও সন্ত্রাস নহে। কে দারু খাওয়াইয়াছিল তাহা মনে করিতে মাতালের সময় লাগায় দেরি হয়।

কলম সিং

রাজনীতির পাচন

রামের হাসি চওড়া হয় ‘সেকুলার’দের ধর্মচর্চায়!

জয়ন্ত গুহ

ভারতের ১৭তম লোকসভা নির্বাচন যত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ততই তিক্ত ও বাঁধনছাড়া হয়ে উঠছে। লাগাম টানতে আসরে নামতে হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। এমনকি সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে, রাহুল গান্ধিকে সংযত করার জন্য। বাদ নেই যোগী আদিত্যনাথ, আজম খান, মানেকা গান্ধি, নভজ্যোত সিং সিধু বা বাংলা বিজেপির মহাদেব সরকার। এরা ছাড়াও আর অনেকেই অসংসদীয় কথাবার্তা বলেছেন এবং এখনও বলছেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই স্টার নন, টিআরপি নেই, তাই হয়ত সবার নজরে পড়েনি। কিন্তু ব্যক্তি আক্রমণ এবং কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে আক্রমণ বা তাঁদের ভোট টানার জন্য রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা যে সস্তা, নোংরা কথা বলছেন, কুরুচির পরিচয় দিচ্ছেন তাতে লাভ কার? মুখ পুড়ছে ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির এবং বিরোধী নেতা নেত্রীদের নিয়ে, মানুষ আরও হতাশ হচ্ছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী এবং বিরোধিতার দায়িত্ব অনেক বেশি। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

দায়িত্ব সাধারণ মানুষেরও আছে। তাঁরাই তো ভোট দিয়ে নির্বাচন করবে সরকার। জনতা যা পছন্দ করবে না, নেতা নেত্রীরা সেটা এড়িয়ে চলবেন। কিন্তু জনতাই তো বদলে গেছে। জনসভায় নেতা নেত্রীরা যখন ১৭তম লোকসভা নির্বাচনের প্রধান ৯টি ইস্যু অথবা রাজনৈতিক ইস্তাহার নিয়ে কথা বলছেন, তখন জনতা চুপচাপ। যেই ব্যক্তি আক্রমণ এবং সস্তা চটুল মন্তব্য শুরু হল, ঝড় উঠছে হাততালির। সজনেখালি থেকে সিমলা সর্বত্র একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

বিষয়টা আমার আপনার কাছে খুব সোজা মনে হলেও, নেতাদের কাছে মোটেই সোজা নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের নিয়ে মিমস ট্রোল বা চটুল হাস্যরস, আমজনতার খুবই প্রিয়। ভারি কথা তাঁরা বেশিক্ষণ শোনেন না। সাধারণ মানুষ ঝুড়ি ঝুড়ি প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাস করে না। মন মাতানোর পুরনো পদ্ধতি আর কাজে দিচ্ছে না। তাহলে পার্টির ন্যারেটিভ কী হবে? কেমন করে মানুষের কাছে পৌঁছে

ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে বিজেপি রামচন্দ্রের বদনাম করছে! রাহুল মাঝেমধ্যেই শিবভক্ত হয়ে যাচ্ছেন। মন্দিরে পুজোয় বসে পড়ছেন প্রিয়াঙ্কা। রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তীতে তৃণমূলের মিছিল। আশ্চর্য! এরা তো নির্বাচনের ফলাফল দেখে, সবাই মিলে একটা সেকুলার ফ্রন্ট তৈরি করতে চায়! তাহলে ধর্মের সঙ্গে এদের যোগাযোগ কোথায়?

দিতে হবে সেই ন্যারেটিভ! কী বললে মানুষ বিশ্বাস করবে? কী বললে নেগেটিভ ইমপ্যাক্ট হতে পারে! সোশ্যাল মিডিয়ায় কত শতাংশ ব্যক্তি আক্রমণ এবং কত শতাংশ সরকারি প্রকল্পের কথা বলতে হবে?

স্থানীয় এবং সর্বভারতীয় বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে মনে হয়েছে, বিজেপি ও কংগ্রেস ছাড়া বেশিরভাগ দলের নেতারাই এ বিষয়ে অসহায়। বুঝতে পারছেন না আসলে কোন ওষুধে কাজ দেবে। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে বিজেপি রামচন্দ্রের বদনাম করছে! রাহুল মাঝেমধ্যেই শিবভক্ত হয়ে যাচ্ছেন। মন্দিরে পুজোয় বসে পড়ছেন প্রিয়াঙ্কা। রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তীতে তৃণমূলের মিছিল। আশ্চর্য! এরা তো নির্বাচনের ফলাফল দেখে, সবাই মিলে একটা সেকুলার ফ্রন্ট তৈরি করতে চায়! তাহলে ধর্মের সঙ্গে এদের যোগাযোগ কোথায়? মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে, অথচ রাম, হনুমান, দুর্গা, কালী সবেতেই আছেন। মমতা ব্যানার্জী-তো মা সন্তোষী, শীতলা এবং মঙ্গলচণ্ডীতেও আছেন। করছেন করুন, ক্ষতি নেই। অন্তত বিজেপির তাতে কোন ক্ষতি নেই। বরং তাঁদের মুখের হাসি আর চওড়া হচ্ছে। বিজেপির জন্য ফ্লাডগেটটা আরও বিস্তৃত হয়ে খুলে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। যেটা উত্তরপ্রদেশে বিজেপির জন্য খুলে দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধি। কার নির্দেশে মনে আছে তো? উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া জেলার সেই বিখ্যাত দেওরা বাবা। অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে, ১৯৮৯-র ১০ নভেম্বর রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার আগে যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিং এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন ডি তিওয়ারি।

৬ নভেম্বর ১৯৮৯, ফৈজাবাদ থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন রাহুল গান্ধির বাবা রাজীব গান্ধি। সেই প্রচার সভাতেই ঘোষণা করেন, “রামরাজ্য হবে দেশজুড়ে”। “রাম জন্মভূমি” তখনও পর্যন্ত কোন ইস্যু নয়। লোকসভায় টিমটিম করছে বিজেপি-র মাত্র দুজন সাংসদ এবং অযোধ্যায় বিতর্কিত নির্মাণ থেকে দূরে, রামের নামে একটি মন্দির তৈরির দাবি ছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের। প্রথম দফা শেষ করে দ্বিতীয়বার নির্বাচনের মুখোমুখি রাজীবের নেতৃত্বে কংগ্রেস তখন দিশাহারা। একদিকে বফর্স এবং ভিপি সিং-র চাপ। অন্যদিকে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখতে এবং গোঁড়া শরীয়তপন্থীদের চাপে, শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের যুগান্তকারী রায়-কে রাজনৈতিক ভাবে কার্যত খারিজ করে দিয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে দেশজুড়ে সমালোচনার মুখোমুখি। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তখন একটা ইস্যু খুঁজছে কংগ্রেস। রাজীবের ব্যক্তিগত সচিব, আর কে ধাওয়ানের কথায়, প্রধানমন্ত্রীর ‘ইন্টেলিজেন্স’ এবং বিভিন্ন রাজনীতিকরা তাঁকে অযোধ্যা থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করার পরামর্শ দেন। আসলে তা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির তাস। দক্ষিণপন্থী বিজেপির ইস্যু কেড়ে নিয়ে রাজনীতির তাস বানাতে চেয়েছিল সেকুলারিস্ট কংগ্রেস। রামরাজ্যের ঘোষণা দিয়ে ৬ নভেম্বর ১৯৮৯, ফৈজাবাদে সেই তাস খেলেন রাজীব গান্ধি। এরপর খেলাটা ধরে নেন লালকৃষ্ণ আদবানি এবং ভারতীয় রাজনীতির ভিত্তিটাই আমূল বদলে দেন। এখান থেকেই

শুরু ভারতীয় রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থীদের উত্থান। ১৯৮৯-এর নির্বাচনে কেউই গরিষ্ঠতা পায়নি কিন্তু লোকসভায় ২টি আসন থেকে বিজেপি পৌঁছে গিয়েছিল ৮৫টি আসনে।

আজকের দিনে ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতপাত এবং আইডেন্টিটি পলিটিক্স-কে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কোনও দল নেই যারা ধর্মকে ব্যবহার করছে না। যদিও জিন্নার ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দাবি মেনে নিয়েছিলেন নেহরু। কিন্তু যতক্ষণ ভারতবর্ষে কংগ্রেসের একদলীয় শাসন চলেছে ততক্ষণ ধর্ম এবং রাজনীতিকে তাঁরা আলাদা করে রাখতে পেরেছেন। অন্তত মুখে বলেছেন। কিন্তু একমাত্র হিন্দু দক্ষিণপন্থী দল বিজেপি চ্যালেঞ্জ করাতেই, নিমেষে ভেঙ্গে পড়েছে কংগ্রেসের সেকুলারিসমের দেওয়াল। শুধু তাই নয়, বিজেপির চ্যালেঞ্জে সাড়া দিয়েছে একাধিক দল। সরাসরি ধর্মের রাজনীতি করছেন হায়দ্রাবাদে আসাউদ্দিন ওয়েসি, আসামে বদরুদ্দিন আজমল, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা এবং পাঞ্জাবে অকালি দল। এমনকি সেকুলার মায়াবতি, মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটারদের কাছে সরাসরি আহ্বান জানিয়েছিলেন, "ভোট যেন ভাগ না হয়। মহাগঠবন্ধন-কে ভোট দিন"। পাশাপাশি রাহুলের ওয়াইনার থেকে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য "দেশের হিন্দু ক্রোধ থেকে বাঁচতে ওয়াইনার থেকে লড়ছেন রাহুল, যেখানে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘু"।

পশ্চিমবঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিজেপি-টিএমসি পোলারাইজেশনের রাজনীতি করছে। তবে এক্ষেত্রে দুজনেই দুজনের পরিপূরক। একজনের জন্য আরেকজনের ভোট সংগঠিত করতে সুবিধা হচ্ছে। তবে ২০১৪-র তুলনায় ২০১৯, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কঠিন নির্বাচন কোনও সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের মতই "সেন্টার লেফট পার্টি" তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে, ২০১৪ সালে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ থেকে কোনও চ্যালেঞ্জ ছিল না। কিন্তু একসময় রাজীব ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেত্রী, পরবর্তী সময়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণপন্থীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির ফ্লাডগেট খুলে দেন। ক্ষমতায় আসার পর ২০১২ সালে ঘোষণা করেন ইমাম ও মুয়াজ্জিম ভাতা। ৩৪টি আসন পায় তৃণমূল ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে। যদিও ধর্মের ভিত্তিতে ইমাম-মুয়াজ্জিম ভাতার সরকারি ঘোষণা ধিকৃত হয় হাইকোর্টে। সেকুলার তৃণমূলের এই নির্বাচিত অনুগ্রহ মধ্যবিত্ত হিন্দু ভোটারদের একাংশ সহ এক বিরাট অংশের মানুষের মনে বিরক্তি তৈরি করে। এই মোক্ষম সময়ে বাংলার মাটিতে বিপুল প্রসার শুরু হয় আরএসএস এবং সঙ্ঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনের। ধর্মের রাজনীতিতে তাঁরা বরাবর শক্তিশালী ও সিদ্ধহস্ত। এবং যে কোনও সেকুলার দলের তুলনায়, ধর্মের রাজনীতিতে তাঁরা ১০০ মাইল এগিয়ে থাকবে। উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে রামরাজ্যের ঘোষণা ও শিলান্যাস করে বিজেপির কাছে ধর্মের রাজনীতির ফ্লাডগেট খুলে দিয়েছিল কংগ্রেস। সেই একই কাজ (বা বিপর্যয়) বাংলায় স্বাধীনতার পর প্রথমবারের জন্য জন্য করলেন একদা রাজীব ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেত্রী, অধুনা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাহলে কি মমতার ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি বা বিজেপির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মেরুকরণের রাজনীতি, মমতার রাজনৈতিক ভুল? একেবারেই না। অন্তত ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ভুল বলা যাবে না। কেননা ২০১৪-র লোকসভা এবং ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন, দুটিতেই চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছে তৃণমূল। যদিও ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আরএসএস ও বিজেপির মেরুকরণ রাজনীতি বিপুল প্রসার পেয়েছে- আসানসোল, ধুলাগড়, খড়গপুর এবং বসিরহাটের ঘটনায়। যদি কেউ দাবি করে, সংঘ ও বিজেপির এই প্রসার তো মমতা চেয়েছিলেন, এটা রাজনৈতিক চাল? সংঘ ও বিজেপির থাবা বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে। ঘরে বাইরে তৃণমূলের আক্রমণে দিশাহারা বাম-কংগ্রেস নেতা কর্মীদের বিজেপি শিবিরে "শেলটার"। মাঝখান থেকে বিরোধী ভোট ব্যাঙ্ক ভাগ হয়ে গেল। তৃণমূল চূড়ান্ত সাফল্য পেল। মমতার বাম-কংগ্রেস শিবিরের বিভাজন সাকসেসফুল। এখানে আবার মুনাফা পেয়েছে বিজেপি। কেননা দেশজুড়ে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টদের নির্মূল করা বিজেপির ঘোষিত নীতি। খুব স্বাভাবিকভাবেই যে নীতি থাকার কথা একটি দক্ষিণপন্থী দলের। এবং এই ইস্যুতে একই রাজনৈতিক লাইনে অবস্থান করছে বিজেপি-তৃণমূল। এতটাই কাছাকাছি সেই অবস্থান যে পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজত্বের অবসান ঘটাতে সরাসরি আরএসএস-এর সমর্থন চেয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-২০০৩ সালে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩।

১৯৯৮ সালের আগে তিনি কংগ্রেস নেত্রী। তখন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সেন্টার লেফট সোশ্যালিস্ট। লক্ষ কম্যুনিস্ট বিরোধিতা। ৯৮-এ তৃণমূল দল গঠনের পর, ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি বিজেপি-কে সমর্থন দিয়েছেন, এনডিএ সরকারে থেকেছেন। মাঝে একবার ২০০১ সালে বিজেপির সঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন। বিধানসভা ভোটে বিজেপির তুলনায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা লাভদায়ক মনে করেই জোট ছেড়েছিলেন। লাভ না হওয়ায় আবার বিজেপি-তেই ফিরে যান। ১৯৯৮ সালে লোকসভা ভোটে ৪২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল-বিজেপি, একে অপরের জন্য আসন ছেড়ে রেখে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। তারপরে মমতাই প্রথম অবিজেপি নেত্রী যিনি "বিজেপি অচ্ছুৎ নয়" বলে ঘোষণা করেন। ২০০২ সালে গোধরা কাণ্ড নিয়ে উত্তাল সংসদে ঠিক হয়, গুজরাট পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে এবং আলোচনা শেষে প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি। তৃণমূল কংগ্রেসই প্রথম বাজপেয়ীকে লিখিতভাবে জানিয়েছিল তারা ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে। সরকারের পক্ষে ভোট দেবে। ঘটনার উল্লেখ করে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (১লা মে, ২০০২ আনন্দবাজার পত্রিকা) লেখা হয়েছিল, "...কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ফিরিয়া পাইতে মরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে বাজপেয়ীকে খুশি করার এমন মওকা হাতছাড়া করা কঠিন। ইহার পরও গুজরাতের নিহত-নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের জন্য তাঁহার উদ্বেগ যেমন কুম্ভীরাশ্রু বলিয়া গণ্য হইবে, তেমনই নরেন্দ্র মোদীর ইস্তফার দাবি প্রতারণামূলক ও লোক-দেখানো শোনাইবে"।

ঘটনাক্রম বলছে, মমতা নিজের প্রয়োজনে এবং বিজেপির প্রয়োজনে সবসময় বিজেপির সঙ্গেই থেকেছেন এবং ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন অবধি সরাসরি আরএসএস-র প্রশংসা কুড়িয়েছেন। লক্ষ্য একটাই, পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান এবং ভবিষ্যতে কম্যুনিস্টদের যেন ফের ক্ষমতা বৃদ্ধি না হয়। দক্ষিণপন্থী আরএসএস-রও একই লাইন। ২০১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর কলকাতা সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে আরএসএস-এর একটি সাংগঠনিক সভা হয়। সেই সভায় মোহন ভাগবত প্রকাশ্যে বলেন, তারা পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু করতে পারেন না যাতে কমিউনিস্টদের সুবিধা হয় বা কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ফিরে আসার কোনও রকম সুযোগ পায়। এই কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা থেকে সরাতে ২০০৩ সালে সরাসরি আরএসএস-র সমর্থন চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলা যেতে পারে, জ্যোতি বসুর নেতৃত্বাধীন কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য, প্রকারান্তরে মমতা সেদিন নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং অবশ্যই সেদিন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান, সেন্টার লেফট সেকুলার সোশ্যালিস্ট হিসেবে ছিল না।

ঘটনাক্রম বলছে, মমতা নিজের প্রয়োজনে এবং বিজেপির প্রয়োজনে সবসময় বিজেপির সঙ্গেই থেকেছেন এবং ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন অবধি সরাসরি আরএসএস-র প্রশংসা কুড়িয়েছেন। লক্ষ্য একটাই, পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট শাসনের অবসান এবং ভবিষ্যতে কম্যুনিস্টদের যেন ফের ক্ষমতা বৃদ্ধি না হয়। দক্ষিণপন্থী আরএসএস-রও একই লাইন। ২০১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর কলকাতা সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে আরএসএস-এর একটি সাংগঠনিক সভা হয়। সেই সভায় মোহন ভাগবত প্রকাশ্যে বলেন, তারা পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু করতে পারেন না যাতে কমিউনিস্টদের সুবিধা হয় বা কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ফিরে আসার কোনও রকম সুযোগ পায়। এই কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা থেকে সরাতে ২০০৩ সালে সরাসরি আরএসএস-র সমর্থন চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আরএসএস মুখপত্র পাঞ্চজন্যের সম্পাদনায় 'কমিউনিস্ট সন্ত্রাসবাদ' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ২০০৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর আরএসএস-র মঞ্চে বক্তৃতা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মোহন ভাগবত, এইচ ভি শেষাদ্রি, মদনদাস দেবী প্রমুখ শীর্ষ আরএসএস নেতাদের উদ্দেশে তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন, "আমি আগে কখনও এতজন আরএসএস নেতার সঙ্গে বৈঠক করি নি। তবে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক। আমি জানি আপনারা দেশকে ভালোবাসেন।" (দ্য টেলিগ্রাফ ১৫ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩) এই মঞ্চে দাঁড়িয়েই তৃণমূল নেত্রী আহ্বান জানিয়েছিলেন, আরএসএস যদি তাঁকে ১ শতাংশ-ও সমর্থন করে, তাহলেই তিনি "লাল সন্ত্রাসের" সঙ্গে লড়ে যাবেন। উল্লসিত আরএসএস নেতা বলবীর পুঞ্জ মঞ্চেই ঘোষণা করেন, "হামারি পেয়ারি মমতাদি সাক্ষাত দুর্গা"।

পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা অনেক আগে থেকে হাওয়া বুঝতে পারেন এবং তাৎক্ষণিক ভাবে ভুল মনে হলেও পরবর্তী সময়ে বোঝা যায় তাঁর রাজনীতির আড়াই প্যাচের চাল। ১৯৯৯ এবং ২০০৪-এ তিনি ছিলেন এনডিএ জোটে। ২০০৯-এ ইউপিএ জোটে। ২০১১-তে রাজ্যে ক্ষমতা দখল। ঠিক তার পরপরই ২০১১ সালের ১৪ মে আনন্দবাজার পত্রিকায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে প্রকাশিত হয় গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি উত্তর সম্পাদকীয়। শিরোনাম ছিল- প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে দিন। মমতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নরেন্দ্র মোদি লিখেছিলেন, "আদরণীয় মমতাবেন, প্রথমেই আপনাকে আমার অভিনন্দন। আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথমেই বলি,আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কথাটা বললাম, আপনি একজন দৃঢ়চেতা মুখ্যমন্ত্রী। আপনার বুদ্ধিমত্তার উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রশাসনিক কঠোরতা খুব আবশ্যক। এই কঠোরতা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি"।

এরপরও বহুভাবে বহুবার আমরা দেখেছি, দুই পক্ষই একে অপরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে

২০১১ সালের ১৪ মে আনন্দবাজার পত্রিকায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে প্রকাশিত হয় গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি উত্তর সম্পাদকীয়। শিরোনাম ছিল- প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে দিন। মমতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নরেন্দ্র মোদি লিখেছিলেন, "আদরণীয় মমতাবেন, প্রথমেই আপনাকে আমার অভিনন্দন। আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা।

দিয়েছে। আরএসএস-র মুখপত্রে বারবার প্রশংসা করা হয়েছে মমতা এবং তাঁর সরকারকে। ২০১৬ পর্যন্ত এই পারস্পরিক আদানপ্রদান ছিল সরাসরি। মনে হচ্ছিল, দীর্ঘদিন বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকে সইয়ে নেবার জন্য প্রধান অনুঘটকের ভূমিকায় কাজ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনও পর্যন্ত মমতার রোষে বিজেপি নয়, সিপিএম। তৃণমূলের কাছে তাড়া খেয়ে ২০১৬-র মধ্যে, সিপিএম ও কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা, যে যার মত ছিটকে গেছে, তৃণমূল ও বিজেপি শিবিরে। এবার বিজেপি তৃণমূলের লড়াই শুরু হওয়ার কথা। ১৭-তে ছিল সেই লড়াইয়ের মুখবন্ধ, ১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে সেই লড়াই শুরু। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই পক্ষের এই যুদ্ধ, মূলত মোদি-মমতা যুদ্ধ একটা "লার্জার দ্যান লাইফ" আকার নেয়। যেখানে অন্য দল প্রায় অশরীরী। মাত্র দুটি মুখ। ভোট ও ভাবনা ঘুরছে ওই দুটি মুখকে ঘিরেই। মোদি ও মমতা।

কারুর অনুমান, একটা যেন রাজনৈতিক ধোয়াশা তৈরি করা হচ্ছে। কে কার শত্রু-মিত্র সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সংসদে বিরোধিতার সুর চড়ালেও, সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে ইউপিএ-র আনা কোনও প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করে নি তৃণমূল। কড়া সমালোচনা করেছে কিন্তু ভারতের প্রধান বিচারপতির ইমপিচমেন্ট মোশন বা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে, কংগ্রেসের পাশে থাকেনি তৃণমূল। যদিও রাজনৈতিক সমাবেশ এবং সোশ্যাল মিডিয়ায়, কিন্তু ভোট এগিয়ে আসতেই মারমুখি ভঙ্গিমায় তৃণমূল-বিজেপি। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তাই, ২০১৯ ভোটের পরীক্ষায় দুজনেরই যদি মোটামুটি পাশ মার্ক হয়ে যায় তাহলে নির্বাচনের পর দুই পক্ষ কতটা যুযুধান থাকবে? বিহারে নীতিশ কুমারের মত পথ কি মমতা নিতে পারেন? কারণ পুরনো এই দোসরদের লড়াইয়ের সুযোগ নিয়ে বাংলায় কং বা বাম কারও পুনরুত্থান হোক, তাও কামনা করে না দুপক্ষের কেউই। দেশজুড়ে ফল যে রকমই হোক, কোথাও কারও চরম আধিপত্য থাকবে না এটুকু বলা যেমন সহজ, তেমনই আগামীদিনে রাম-বিরোধিতায় 'সেকুলার' পোশাক কতটা আবহাওয়া অনুকূল হবে সে নিয়ে সংশয়ে আমরা সবাই!

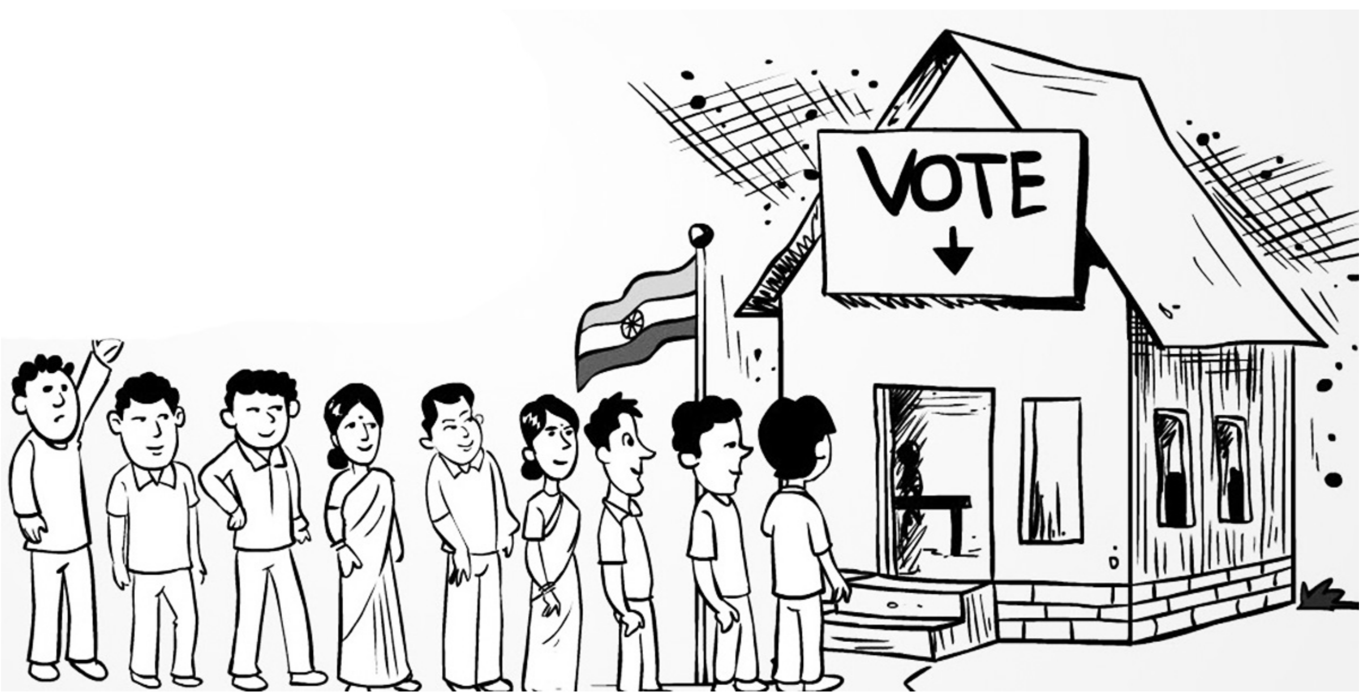

প্রবাসীর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ

আঙ্গুর ফল টক

কল্যাণ বল্লভ গোস্বামী

গত পয়লা বৈশাখ রাতে আমি আমার মাতৃশহরের এক ভ্রাতৃপ্রতিম শিক্ষক মহাশয়ের সাথে কথা বলছিলাম। উনি পেশাদার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয়েও একটি রাজনৈতিক দলের সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ওনাকে বলেছিলাম যে উনি ওনার আদরের রাজনৈতিক দলটির থেকে যেন এখন একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলেন। কারণ, ওই দলটি জনমানসে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এটাও আন্তরিক ভাবে উল্লেখ করতে ভুলিনি যে, ৩৪ বছর বয়স্ক বামেদের ইমেজ ৭ বছর বয়স্ক শিশু দামাল ভাইয়েদের থেকে অনেক অনেক ভালই ছিল। তাও গণতন্ত্রের ঘূর্ণাবর্তে বামেরা আজ ইতিহাসের পাতায়। গণতান্ত্রিক দেশে বাড়াবাড়ি ধোপে টেকে না। মনে রাখতে বলেছি যে, জনগণের ক্ষমতা নকুলদানার ক্ষমতার চাইতে অনেক অনেক বেশি।

যাইহোক, গতকাল সেই শিক্ষক মশাই বেশ সুন্দর জবাব দিয়েছেন, কোন রাজনৈতিক দলটি ধোয়া তুলসি পাতা? তুই আমার দলের দিকেই শুধু আঙুল কেন তুলছি? ক্ষমতা থাকলে লোকে তো খাবেই। যার ক্ষমতা নেই, সে খেতে পায় না, তাই পথে বসে কাঁদে !

শিক্ষক মশাই ব্যক্তিগতভাবে মিতভাষী ভদ্র মার্জিত এবং সৎ। আমি আগেও বারংবার ওনাকে ভ্রষ্টাচারি ক্ষমতাপিপাসু ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকার অনুরোধ করেছি। বারে বারে সততা আদর্শের রাজনীতির উল্লেখ করায়, আমায় শুনতে হল "আঙ্গুর ফল টক" সেই চিরাচরিত প্রবাদ বাক্যটি। এও জানতে পারলাম যে, কেবলমাত্র বাংলার সেই লোকেরাই শাসক দলের নিন্দায় আজকাল মুখর, যারা ক্ষমতা কিংবা পয়সার স্বাদ পাচ্ছেন না। কিংবা হরির লুটের বাতাসা যাদের কোলের উপর এসে পড়ে নি।

বেনোজল যে একটা রাজনৈতিক দলের কতটা ক্ষতি করতে পারে, সেটার একটা ট্রেইলার মনে হয় দেখতেই হবে ২৩ মে ২০১৯ তারিখে। বর্তমান রাজ্য সরকার প্রথম বছর দুয়েক বদনামের ভাগী হয়নি। বেনোজল পার্টিতে ঢুকেই আপামর বাংলার ভোটারদের ক্ষিপ্ত করে তোলার মত কাজ সুচারু ভাবে করে ফেলে, এরা মমতাদির পরিশ্রমের দিনে কিন্তু কেউ সাথে ছিল না। যখন শুকনো মাটিতে ঘেমে নেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবর্তনের ঘাসের বীজ বুনছিলেন, এরা কেউ কাছেও আসেনি। আজ তারাই সবাই "আঙ্গুরে" পরিণত হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানেই "আঙ্গুর ফল টক"।

বামেরা ক্যাডারভিত্তিক ছিল, তাই অরাজকতা চৌত্রিশ বছর সময় নিয়েছে দৃশ্যমান হতে। কোথাও না কোথাও একটা লাগাম ছিল। তখন ক্যাডারগিরি ছিল, আজ যেটা দাদাগিরি আনলিমিটেড। আজ, শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সৃষ্ট পচাকেষ্টরা রাজ করছে। যারা নিজেদের আখের গোছাবার জন্য নিত্যদিন নিজের দলকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছে। কী যায় আসে, কাল দরকার হলে ছোট ফুল থেকে নিমেষের মধ্যে বড় ফুলে লাফিয়ে চলে যাবে সবাই। রাস্তা তো খোলাই আছে। আজ রাজনৈতিক আদর্শ ভোগের খাতায়, সবার নজর শুধুই "আঙ্গুরের" দিকে। ওদের প্রতি আঙ্গুল তুললে ওরা তাই মনে করে "আঙ্গুর ফল টক"।

যাইহোক, আমি পশ্চিমবঙ্গে একবারই ভোট দিয়েছি (১৯৮৭, প্রথম ভোট) তারপর থেকে প্রবাসে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্ভট রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আমার একটু আধটুও ভূমিকা নেই। তবে, আমিও আপনাদের মতই একশ ভাগ বাংলার বাঙালি। তাই, সাধারণ জনগণের গলায় গলা মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছে হয়, "দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"।

মনে রাখবেন, পরিবর্তন অনেক পরিশ্রমে এবং ঘাম ঝরিয়ে এসেছে। আমার কোনওমতেই মনে হয় না, জনরোষ মমতা ব্যানার্জির বিপক্ষে। চাকরি বাকরির সংস্থান, সিন্ডিকেট আর ভোটে অরাজকতা বাদ দিলে, বাংলায় গত আট বছরে গ্রামীণ উন্নতি চোখে পড়বার মত। তবে, উত্তর ভারতে থেকে গত তিন দশক ধরে দেখে চলেছি, পাবলিক ক্ষেপলে রাজনৈতিক দলগুলো যেন খোলামকুচির মত উড়ে যায়। এ মুহূর্তে বাংলায় জনরোষ লোকাল নেতৃত্বের বিপক্ষে। প্রতিটি কেন্দ্রেই নির্বাচন হচ্ছে লোকাল নেতাদের দাদাগিরি তোলাবাজি মাফিয়াগিরির কথা মাথায় রেখে। সে কারণেই, এবার নির্বাচনে কোথাও কোথাও বামেরা বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দিতে দ্বিধা করছে না, আবার কংগ্রেস অপাংক্তেয় বামকে ভোট দিয়ে দেবে, বা ক্ষেত্র বিশেষে খাঁটি কংগ্রেসী ভোটার চোখ বন্ধ করে পদ্মও ছুঁয়ে নিতে পারে। কারণ আজ শত্রু বিনাশ একমাত্র লক্ষ্য।

শত্রুটি কে? প্রত্যেকটি নির্বাচন ক্ষেত্রেই অলিখিত শত্রুটি হচ্ছে অসৎ উপার্জন, তোলাবাজি, দাদাগিরি, মানুষকে মানুষ মনে না করা, স্বৈরাচারিতা, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি !

শেষে বলি, গত এক বছর ধরে অনেক লিখেছি, কিন্তু কারো চোখ খোলেনি এবং বোধোদয় হয়নি। মেসেঞ্জারে আলতো থ্রেটও আসে মাঝে মধ্যে। আজকাল শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সর্বত্র একই সমস্যা, কারোই সমালোচনা করা খুব রিস্কি। জীবন বিপন্ন হতে পারে, বসে বসে কেস খেয়ে যেতে পারেন। তাই ছাপোষা শিক্ষিত লোকেরা দিনে দিনে রাজনীতি বিমুখ হচ্ছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই করে খাচ্ছে হাতকাটা আর নাকবোঁচা পঞ্চারা।

এ রাজ্যে মোদির বিপক্ষে লিখলে "দিদির দালালের" তকমা জোটে, আর ছোট ফুলের সমালোচনা করলে বড় ফুলের এজেন্ট বলা হয়। নিরপেক্ষ কলামে নিবন্ধ লিখলেই মেসেঞ্জারে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন সদৈব উড়ে আসে, "আপনার দলীয় অবস্থান ক্লিয়ার করুন স্যার"।

বলুন তো, বাংলায় সবাইকে কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের ধামা ধরতেই হবে, তেমন কোনও ধরা বাধা নিয়ম আছে কি?

(প্রতিবেদক ডুয়ার্স সন্তান, দিল্লিতে দীর্ঘদিন উচ্চপদে কর্মরত)

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

মে দিবস কি ঠিকানাহীন লক্ষ শ্রমজীবির খোঁজ রাখে?

সৌমেন নাগ

চিকিৎসার প্রয়োজনে যেতে হয়েছিল হায়দারাবাদে। সেখানে এক বিখ্যাত জায়গা চারমিনার। হায়দারাবাদ শহরের সেই বিখ্যাত চিকিৎসাকেন্দ্র যার রোগীরা অধিকাংশই আসেন আমাদের গর্বের পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তাই এইসব চিকিৎসাকেন্দ্রে গেলে প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা শোনার জন্য কান দুটোকে চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে খাড়া রাখতে হয় না। বাংলা শব্দের কলধ্বনি মৃদু থেকে বাঙালি সুলভ উচ্চগ্রামের প্রতিধ্বনিতে চিকিৎসাকেন্দ্রের অনুরোধ বার্তা 'SILENCE PLEASE' কে ঠেলে ফেলে বাঙালির উপস্থিতিকে জানান দেয়। পশ্চিমবাংলার এই সব আগত রোগী বাঙালিরা এখানকার ব্যবসার আদরণীয় লক্ষ্মী। চিকিৎসকেরা চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠের সঙ্গে অনেকেই বাংলা বলতে ও বুঝতে শিখে নেন। 'লক্ষ্মীর ভাষা' না জানলে চিকিৎসার পাশাপাশি লক্ষ্মী লাভে একটু অসুবিধা হয়। রাজপথের ওষুধের দোকানে বাংলায় বিজ্ঞাপন 'এখানে ওষুধ কিনলে দশ শতাংশ কমিশন দেওয়া হয়'। রাস্তায় 'দাদা-বৌদি-র' হোটেল। লেখা থাকে 'এখানে বাঙালি খাবার পাওয়া যায়'।

'বাঙালি বিজয় সিংহের সেই শ্রীলঙ্কা জয়ের মতন বাঙালির এই দাক্ষিণাত্য জয়ের গর্বে বাঙালি হিসাবে নিজের রাজ্য ছেড়ে এসে দক্ষিণ ভারতে আসা নিয়ে ক্ষোভের বাষ্প বিলীণ হয়ে যাবার কথা। হোটেলে গিয়ে দাদা বা বৌদির মালিকানার কোনও খোঁজ না পেয়ে বাঙালির আত্মশ্লাঘাতেই প্রথমেই একটা হাতুড়ির ঘা খেতে হয়। মালিক তেলেগু। রান্নাঘরের মশলা ও তেলের ছাপ ধরা পোষাকের রাঁধুনি সেই হাড় জিরজিরে বাঙালি। টেবিলে খাবার পরিবেশনকারি এক বাঙালি বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল সে মালদা জেলার বাঙালি। তবে বাঙালি খরিদ্দারের জন্য তার কোনও দুর্বলতা থাকলেও তা বোঝা যায়নি। তাকে মালিক এখানে এনেছে বাঙালি মনকে আরও বেশি করে খাদ্য তালিকার দিকে টানার জন্য। এর ওপরেই নির্ভর করছে এই হোটেলে তার চাকুরির স্থায়িত্ব।

চারমিনার দেখতে গিয়েও সেখানে বাঙালি। এদের একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল এখানে এসেছে সে মুর্শিদাবাদ থেকে জরির কাজ করতে। সে জানাল এরকম আরও অনেকেই এসেছে তার গ্রাম থেকে। মেদিনীপুর জেলা থেকে এসেছে অনেক। এরা মূলত কাজ করে জরি রূপো আর সোনার গয়নার দোকানে।

এত দূরে কেন এসেছে জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর এল, 'গ্রামে থাকলে খাব কী? কাজ কোথায়?'

উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি সংলগ্ন চা-বাগান দাগাপুর টি এস্টেটের আদিবাসি শ্রমিক হাবিল ওঁরাও। বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকেই বাগানে। এখনও সে বছরের পর বছর ঠিকা শ্রমিক। তার ছেলের বয়স যখন দশ বছর তখনই পাঞ্জাবের ভাতিন্ডার এক সর্দারজির বাড়িতে ছেলেটাকে কাজের জন্য দিয়ে দিয়েছিল। আজ ১৫ বছরের মধ্যে ছেলেটা একবারের জন্যও এখানে আসেনি। বছর পাঁচেক আগে সে একবার ভাতিন্ডায় গিয়েছিল। বাপ ছেলে কেউ কাউকে প্রথমে চিনতেই পারেনি। ছেলে এখন গমের খেতে কাজ করে। মোটামুটি ভালই আছে, তবে সেখানে থাকতে থাকতে হারিয়ে ফেলেছে তার বাড়ির টানকে। হাবিলের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সান্ত্বনা, ছেলেটা বেঁচে আছে, ভাল আছে। তার পাশের লাইনে মিনু হাঁসদার ১৪ বছরের মেয়েটা যে মুম্বাইতে কাজ করবে বলে গিয়েছিল তার কোনও খোঁজ আজ সাত বছরের মধ্যে পাওয়া যায়নি। কী কাজ করে, কোথায় আছে জানতে পারেনি। হারিয়ে গেছে এখানকার জনজীবন থেকেই।

এই রাজ্যের অগ্রগতি ঘটছে না, কর্মসংস্থান হচ্ছে না, একথা বলার সাহস কোথায়? প্রায় দশ বছরের মা-মাটি শাসন ও তার পূর্ববর্তী ৩৪ বছরের শ্রেণি সংগ্রামের সেনাপতি মার্কসবাদী শাসন। হায়দরাবাদে দেখা এইসব মানুষগুলি অথবা হাবিল ওঁরাও-এর ছেলে বা মিনু হাঁসদার খোঁজ না পাওয়া মেয়ে যদি প্রশ্ন তোলে 'গ্রামে থাকলে খাব কী? সেখানে কাজ কোথায়?' —জবাব দিতে উভয় রাজত্বের রাজার সেনারা হয়ত একে অবান্তর বলে এড়িয়ে যাবে। তবে এটাই রূঢ় বাস্তব। দলে দলে এ রাজ্য থেকে ভিন্ রাজ্যে কাজের খোঁজে পাড়ি দিচ্ছে এই সমস্ত তরুণ ও তরুণীর দল। এমনকি বয়স্ক মানুষ। কোথায় তারা? কেমন আছে? সবার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এদের ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না। এদের যে অনেকেরই ঠিকানা নেই।

১লা মে

গত বছরই ছিলাম ব্যাঙ্গালোরে। শিল্প শহর। ভারতের 'সিলিকন সিটি'। ১লা মে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে প্রতিপালিত হয়েছি। এই রাজ্যে ১লা মে-কে কেন্দ্র করে হত মিছিল। আকাশ লাল হয়ে উঠত লাল পতাকায়। ১৮৮৬ সালে চিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করার দাবিতে যে শ্রমিক সমাবেশ ঘটেছিল তাকে ছত্রভঙ্গ করতে মালিকের পুলিশবাহিনী গুলি চালালে ১২ জন শ্রমিক সেই গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন। সেদিন সেই ঘটনা ইতিহাসের এক যুগসন্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দুনিয়ার শ্রমিক মহলে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'— প্রত্যয়ের ডাকে যুক্ত হল ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম আর ৮ ঘণ্টা মনের খোরাক। পরাধীন ভারতে এই ঢেউ আসতে অবশ্য সময় নিয়েছিল। ভারতে প্রথম ১লা মে অনুষ্ঠান হয়েছিল ১৯২৯ সালে। পৃথিবীর ৮০টির মতন দেশে ১লা মে'র আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসকে সম্মান জানাতে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষিত হলেও ভারতে কিন্তু এই দিনটি জাতীয় ছুটি ঘোষিত হয়নি। পশ্চিমবাংলা, কেরল, ত্রিপুরা ইত্যাদির মতন কয়েকটি রাজ্যেই রাজ্যস্তরে এই দিনটি ছুটি বলে ঘোষিত হয়েছে।

তো ব্যাঙ্গালোরে কবে ১লা মে নিঃশব্দে অন্য আর একটি সাধারণ দিনের মতন অতিবাহিত হয়ে গেল টের পাওয়া গেল না। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনের জন্য আদৌ একটা কর্মহীন দিন পালনের কোনও যৌক্তিকতা আছে কিনা সেই আলোচনা করার আগে যেটি বলা দরকার এই দিনটি যে সারা পৃথিবীর শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস এবং এর জন্য শ্রমিক শ্রেণির পূর্বসুরীদের সংগ্রামকে সম্মান জানাবার যে

তাগিদ তা কেন আজ শ্রমিক তথা শ্রমজীবি মানুষের ভাবনা থেকে এভাবে ম্লান হয়ে চলেছে?

শিল্পনগরী ব্যাঙ্গালোরে নিজে সেদিন ছিলাম বলে বলতে পারি এই দিনটিতে শিল্প কারখানায় মে দিবস পালনের খবর পাই নি। আরেক শিল্পনগরী মুম্বাই যেখানকার শ্রমিকরা ভারতের বহু শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম ও নেতৃত্ব দিয়েছে সেখানেও এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসটি ক্রমশ আরেকটি সাধারণ দিনের মতনই অতিবাহিত হয়ে চলেছে।

শ্রমিক আন্দোলনের এক পীঠস্থান এই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থানটি কেমন? এখানে ১লা মে সরকারি ছুটি উপভোগকারী চাকুরিজীবিদের ছাড়া সাধারণ শ্রমজীবি মানুষের মনে এই দিনটির কোনও তাৎপর্য বহন করে আনে বলে মনে হয় না। ঘটনা এমন একটি দিকে কেন মোড় নিয়ে চলেছে তার কোনও আত্মসমীক্ষার তাগিদ দেখা যাচ্ছে না।

এখন যে কোনও জাতীয় ছুটি বা অনুষ্ঠান নিয়ে কিন্তু একই প্রশ্ন উঠে আসছে। এই ছুটি কাদের জন্য? এই অনুষ্ঠান কাদের? অসংগঠিত শ্রমিকদের তো এখন প্রায় সর্বত্র ঠিকা কাজ। যেদিন কাজ সে দিন মজুরি। ১লা মে দিবসের ছুটি পালন করার অর্থ সে দিনের মজুরি হারানো। দুনিয়ার মজদুর এক হওয়ার স্লোগানে শ্রমিক সংহতির ডাক দেওয়া এক জিনিস আর তাদের পাশে হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের একাত্মা হওয়া আলাদা জিনিস। সরকারি তথা সংগঠিত সংস্থার শ্রমজীবিমানুষ যারা মে দিবসে বেতন সহ ছুটি উপভোগ করেন তারা কি খোলা গলায় বলতে পারেন মে দিবসে শ্রমিক সংহতি প্রকাশ করতে এসে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ভাইরা যে মজুরি হারাবেন তা আজকের বেতনটি তাদের তহবিলে দান করে সেই মজুরিটি দেওয়া হউক? মনে রাখা দরকার সংহতি কিন্তু আত্মভোগের মাধ্যমে আসে না। এর জন্য দরকার আত্মত্যাগ ও পরস্পরের মধ্যে সমবন্টনের মানসিকতা।

দুনিয়ার মজদুর এক হও

'কেউ পাবে আর কেউ পাবে না,
তা হবে না, তা হবে না,
কেউ খাবে আর কেউ খাবে না,
তা হবে না, তা হবে না।'

মে দিবসের সেই গান যে এখন গাওয়া হয় না। এখন যে যেটুকু পাই সেটুকু আমারই থাক। আগে একের বিরুদ্ধে আঘাত সবার বিরুদ্ধে আঘাত বলে ধরে নেওয়া হত। হুগলি নদী পাড়ের চটকলের শ্রমিকরা তাই আন্দোলনের পথে নামলে শিল্পবন্ধ্যা উত্তরবাংলার শ্রমজীবি মহলেও উঠত সংহতির অনুভব। আওয়াজ উঠত চটকলের 'শ্রমিক বন্ধুরা লড়াই কর আমরা তোমার পাশে আছি'। মালদা থেকে কোচবিহারের পথে পথে কৌটো ঝাঁকিয়ে অর্থ সংগ্রহের স্বতঃস্ফূর্তস্কোয়াড বেরত। এক টাকা দু' টাকার মুদ্রার মধ্যে বার্তা থাকত সেই আন্তর্জাতিক মে দিবসের সংহতি। মুম্বাই-এ গিরিকামগড় ইউনিয়ানের ডাকে সুতা কল শ্রমিকের লড়াইয়ের ডাক এসে পৌঁছে যেত এই রাজ্যের শ্রমিক মহল্লায়।

মে দিবসে সরকারি ছুটি বজায় আছে। নেই মে দিবসের সেই হে মার্কেটের শহীদ শ্রমিকের আর্তি— দুনিয়ার মজদুর একের পাশে এসে দাঁড়াও। তাই উত্তরবাংলার কাঁঠালগুড়ির বন্ধ চা-বাগানে অনাহারে একের পর এক কর্মহীন চা-শ্রমিকের মৃত্যু হলেও বিপ্লবের রাজধানী মহানগরী কলকাতার রাজপথ থাকে নিরুত্তাপ। সে দিনের শ্রমিক সংহতির 'বিপ্লবীরা' নন্দনে নান্দনিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে নিজেদের সংহতিকে হাজির করতে ব্যস্ত।

চা-বাগিচায় শ্রমিক আছে। তাদের কেজো দুটি হাতে কাজ নেই। তবে চা-বাগিচায় যে জিনিসটির অভাব নেই সেটা হল ট্রেড ইউনিয়ন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে এখানে আছে ৩২টি পৃথক পৃথক ইউনিয়ন। সবারই ডাক 'দুনিয়ার মজুর এক হও'। মে দিবসও এক সঙ্গে পালন করার কথা এদের ভাবনায় জায়গা পায় না। এরা চা-শ্রমিকের ইউনিয়ন। এদের মূল নেতৃত্বের তালিকায় কিন্তু এইসব বাগানের আদিবাসি শ্রমিকের

সরকারি তথা সংগঠিত সংস্থার শ্রমজীবিমানুষ যারা মে দিবসে বেতন সহ ছুটি উপভোগ করেন তারা কি খোলা গলায় বলতে পারেন মে দিবসে শ্রমিক সংহতি প্রকাশ করতে এসে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ভাইরা যে মজুরি হারাবেন তা আজকের বেতনটি তাদের তহবিলে দান করে সেই মজুরিটি দেওয়া হউক?

নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। 'বাবু' কমরেড/নেতারাই ভগবানের দরবারে শূদ্রের প্রার্থনাকে পৌঁছে দেবার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মতন মালিকের দরবারে শ্রমিকের 'দাবি'কে পৌঁছে দেবার অধিকারকে একচেটিয়া দখলে রেখে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মন্ত্রের ভাষা যেমন ভক্তকে জানাবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না তেমনই মালিকের সঙ্গে যে ভাষায় 'বাবু' নেতাদের কথা হয় তা আম শ্রমিককে বোঝান ও জানাবার প্রয়োজনের তাগিদ নেই। ধর্মঘটের পর নেতারা এসে ঘোষণা করেন 'ঐতিহাসিক জয়', অথচ সামনে মৃত্যু মিছিল। 'রাম নাম সত্য হ্যায়' শেষ ধ্বনির আওয়াজ ভেসে আসে একের পর বন্ধ চা-বাগিচার শ্রমিক বস্তি থেকে। জয় এসে শেষ হয় হরিবোলের আর্তনাদে।

শ্রমিক দিবসের গান রচিত হয়েছিল সেই ১৮৮৬ সালে শ্রমিকের রক্তে মাটিকে ভিজিয়ে। আজ যে সেই গানের বজ্র কণ্ঠ একেবারে ম্রিয়মান। একের মুখ অপরের কাছে অচেনা হয়ে পড়েছে। একের হৃদ্‌স্পন্দন যে অপরের হৃদ্‌স্পন্দন থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসের সংহতি এক দেশ ছাড়িয়ে অন্য দেশে পৌঁছনো তো দূরের কথা, নিজের পাশের শ্রমিক বস্তি থেকেও আসতে পারছে না। মাঝে পথে বিভেদের করাল ভ্রূকুটিতে পথ হারিয়ে ফেলছে।

একটা ক্ষেত্রে কোনও বিভেদ নেই, বর্ণ ভেদ নেই। সেটা হল ক্ষুধার যন্ত্রণা। শূন্য উদরের পাকস্থলির চাহিদা, আর তার দহনের যন্ত্রণা। তাই পশ্চিমবাংলার আমলাশোলের ইন্দ্র শবরের সঙ্গে রাজস্থানের দুঙ্গারপুরের পূঁজা নানমারের কিংবা উত্তরবাংলার চা-বাগিচার উপেশ লোহারের শূন্য উদরের ক্ষুদার জ্বালার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অথচ শ্রমিক সংহতির জন্য আত্মনিবেদিত শহীদরা চেয়েছিল উর্দ্ধাকাশে দীপ্ত মুষ্ঠির শ্রমিকদের মধ্যে এক আত্মীয়তার বন্ধন গড়তে। তারা ক্ষুধার এই সংহতি দেখতে চান নি। আজ তাই ১লা মে-র শ্রমিক দিবসে শ্রমিকেরা একে অপরের দিকে অচেনা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। 'মে দিবস' হয়ে পড়ে এক সুখী সরকারি কর্মীর ছুটির আমেজের দিবস।

কাজের খোঁজে স্থানান্তরিত মানুষের ঠিকানা কোথায়?

এক সময় ভিন্ রাজ্য থেকে দলে দলে এ রাজ্যে কাজের সন্ধানে মানুষ ভিড় করত। চটকলে, হাওড়া ২৪ পরগনা ও হুগলির শিল্প তালুকে যে অবাঙালি বসতি তাদের বাপ-ঠাকুরদারা তো এই কাজের সন্ধানে এখানে এসে অনেকেই এ রাজ্যে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে নিয়েছিলেন। আজ কর্মসংস্থানের সন্ধানে এখন বিপরীত স্রোত। এই রাজ্য থেকেই কর্মপ্রার্থীরা এখন ভিন্ রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিচ্ছে, কোথায় কাজ পাচ্ছে, কীভাবে আছে তার কোনও খোঁজ রাজ্যের সরকারি দপ্তর রাখে না। এরা সবই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নানা কাজে নিযুক্ত। এদের যেমন চাকুরির ক্ষেত্রে কোনও নিরাপত্তা নেই তেমনই সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনও রক্ষাকবচ নেই।

উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা এলাকা থেকে ভিন্ রাজ্যে

প্রতিদিনই ঘটছে কাজের সন্ধানে অনিশ্চিত যাত্রা। সবচেয়ে ভয়ানক খবর হচ্ছে 'ন্যাশনাল ক্রাইম রিপোর্ট'-এর বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় এখান থেকে ঘটে চলেছে নারী পাচারের ঘটনা। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন থাকলেও এই পরিসরে তা সম্ভব নয়। এ নিয়ে ভবিষ্যতে পৃথক আলোচনা করার ইচ্ছে রইল। এখানে শিলিগুড়ির বুকে চাঁদমণি চা-বাগানের ঘটনাই প্রমাণ করবে এই সমস্যা কত গভীর।

এই বাগানটির সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যখন 'মউ' স্বাক্ষরিত হয়েছিল তখন এই বাগানটির স্থায়ী শ্রমিক ছিল ২৫০। অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩০০-র বেশি। এছাড়া বাগানের নানা কাজে যে ৩৩২টি শূন্যপদ ছিল সেখানেও মাঝে মধ্যে কাজ পেত স্থানীয় মানুষ। অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে এই চা-বাগিচার ৪০৬.৬৪ একর জমি দীপঙ্কর চ্যাটার্জির মালিকানাধীন চাঁদমণি টি কোম্পানির কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে দীপঙ্কর চ্যাটার্জিদেরই প্রমোটার সংস্থা লক্ষ্মী টাউনশিপ কোম্পানিকে তার প্রমোটারি কারবার স্থাপনের জন্য দেওয়া হল। চা-বাগানের জমির মালিক রাজ্য সরকার। ১৯৫৩ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের টি অ্যাক্টের ১৪, ১৬ এবং ১৭ নং ধারা অনুসারে কোনও চা-বাগান চালাবার মতন অবস্থায় না থাকলে সেই বাগানটি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা নিতে হলে বোর্ডের অনুমতি বাধ্যতামূলক। সেই সব নিয়ম মেনে এই জমি এক প্রমোটারের হাতে অর্পন করা হয়েছিল কিনা এবং সেই হস্তান্তরের প্রশ্নে বিপুল পরিমাণের আর্থিক লেনদেন নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল সেগুলি নিয়ে এখানে এই পরিসরে আলোচনার সুযোগ নেই। প্রশ্নটা হচ্ছে এই বাগানটি উচ্ছেদ ঘটাবার পর এখানকার শ্রমিকদের পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা করা হল না। চ্যাটার্জিরা জানাল, এখান থেকে ২৫ কিমি দূরে নকশালবাড়ির এক পাথুরে জায়গায় সুবল ভিটায় ৪০ একর জমিতে নাকি ৬৬৪.৩৯৫ একরের চাঁদমণি চা-বাগানকে 'স্থানান্তরিত' করে শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ওই ৪০ একর জমিতে ৩০ বছর আগে থাকতেই বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা বসবাসের জন্য কুড়েঘর নির্মাণ করে বাস করছিল। আজ কিন্তু চাঁদমণি চা-বাগানের সেই শ্রমিক ও তাদের পরিবার কোথায় আছে কেমন আছে তার কোনও খোঁজ নেই। এদের অধিকাংশই যে ঠিকানাহীন দিনমজুরের কাজে ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা জরুরি বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। ভিন্ রাজ্যে কর্মসংস্থানের খোঁজে যাত্রা করাটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। সেখানকার পরিবেশে তাদের মানসিক অবস্থার ওপর কী প্রভাব ফেলে সেটাও গভীর ভাবে ভাবার বিষয়।

বিশ্ব সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ প্রবলেম অ্যান্ড রেসপন্স ইন লো ইনকাম কান্ট্রি'স' প্রতিবেদনে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় এই ভাবে স্থানান্তরিত মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার ফলে জন্ম দেয় নানা অপরাধমূলক মনোভাব, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অবিশ্বাস এবং অবসাদ। এরই প্রতিফলন ঘটছে অ্যালকোহল থেকে শুরু করে নানা ধরনের মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি। এরা বহু ক্ষেত্রে জাতিগত দাঙ্গা, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ডের মত ভয়াবহ অপরাধে যারা জড়িত ছিল তারা সবাই ছিল বস্তির ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বাসিন্দা এবং জীবিকার তাগিদে তাদের বাসভূমি ছেড়ে আসা মানুষ। বিশ্বসংস্থার প্রতিবেদনে

বিশ্ব সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ প্রবলেম অ্যান্ড রেসপন্স ইন লো ইনকাম কান্ট্রি'স' প্রতিবেদনে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় এই ভাবে স্থানান্তরিত মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার ফলে জন্ম দেয় নানা অপরাধমূলক মনোভাব, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অবিশ্বাস এবং অবসাদ। এরই প্রতিফলন ঘটছে অ্যালকোহল থেকে শুরু করে নানা ধরনের মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি। এরা বহু ক্ষেত্রে জাতিগত দাঙ্গা, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য দীর্ঘদিন বাসভূমি থেকে উৎখাত হতে বাধ্য হওয়ায় মানসিক অসুস্থ এই ধরনের মানসিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। Walter Fernandes, J.C. Das এবং Sam Rao তাঁদের 'Displacement and Rehabilitation-An Estimate of Extent and Prospect Indian Social Science-1989 প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তথ্যে দেখা যায় এদেশে বিভিন্ন প্রকল্পের নামে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল ১,৬৫,০০,০০০ জন। এদের মধ্যে ৩৯,৫০,০০০ জনকে পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বাকি ১,১৫,০০,০০০ জন দধিচী ঠিকানাহীন হয়ে স্থানান্তরিতের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য উচ্ছেদ হওয়া মানুষের একটা হিসেব তাও পাওয়া যায়। কিন্তু চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্তক্ষরণের মতন প্রতিদিন যে উত্তরবঙ্গ সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে কর্মসংস্থানের খোঁজে একে করে মানুষ তার বাসভূমি থেকে অনিশ্চিয়তার ঝুঁকিকে মাথায় নিয়ে ঠিকানাহীনদের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের তো কোনও হিসেব থাকে না। যে মায়ের কোল শূন্য করে তারা হারিয়ে যায় সেই মা শুধু বসে থাকে সেই শূন্য কোলে হারিয়ে যাওয়া সন্তানের খোঁজ পাওয়ার অপেক্ষায়।

উত্তরবঙ্গের এক সময়ের পরিচয় ছিল 'থ্রি টি' বলে— ট্রাক, টিম্বার ও টি। এখনকার প্রাচীন অধিবাসিরা সবাই আদিবাসি ও তফশিলি জনজাতিভুক্ত। এখানে বনভূমিতে ছিল মানুষের আহার এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয় উপকরণ। বন্য জন্তুদের জন্য বনভূমিতে ছিল তাদের আহার। এখনকার বনভূমির প্রধান গাছ ছিল শাল। এই শালের গোড়ায় জন্মাত এক শ্রেণির গুল্ম। এই পুষ্টিকর গুল্ম যেমন বনবাসী মানুষের ক্ষুধা মেটাত তেমনই বিশালদেহী হাতি ও অন্য তৃণভোজী প্রাণীদেরও খাদ্যের দাবি পূরণ করত। বাজারের চাহিদা অনুসারে শাল গাছের পরিবর্তে এখন এই বনভূমিতে লাগান হল সেগুন। ফলে সেই গুল্ম হয়েছে অদৃশ্য। কারণ গাছের জগতে স্বার্থপর বলে পরিচিত সেগুন তার গোড়ায় অন্য গুল্ম বা গাছকে জন্মাতে দেয় না। এর ফলে শুধু বনবাসীরাই হারিয়েছে তাদের খাদ্য তা নয়, হাতিসহ অন্য প্রাণীরাও পাচ্ছে না তাদের সেই ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ। খাদ্যের খোঁজে বনের প্রাণীরা আসছে বনভূমি সংলগ্ন লোকালয়ে আর এখানকার মানুষেরা খাদ্যের সন্ধানে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে। দুয়ের মধ্যে আরেকটা মিল আছে। উভয়েই নিজেদের পরিবেশ ছেড়ে নতুন পরিবেশ এসে বিপদের সম্মুখীন হয়। বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে অনুপ্রবেশকারি রূপে মানুষের আক্রমণে প্রাণ হারায় আর এক নিজ বাসভূম ছেড়ে অন্য রাজ্যে খাদ্যের সন্ধানে এই মানুষগুলিও সেখানকার পরিবেশে আরেক ধরনের অনুপ্রবেশকারি বলে ভাষাগত ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস ১লা মে থেকে যায় তুলনামূলকভাবে এদেশের কয়েকটি রাজ্যের ক্যালেন্ডারের ছুটির তালিকার দিবস হিসাবে। দিনটি কখন পার হয়ে যায় খেটে খাওয়া মানুষ টের পায় না। পাবেই বা কী করে? ঠিকানা যাদের নেই তারা হে মার্কেটের সেই ঘটনারর ঠিকানা জানবেই বা কী করে? সেই ঠিকানা দেবার দায়িত্ব নেবার লোকই যে নেই।

তবু বিপুল ভোট দিল ডুয়ার্স কীসের আশায় ?

গৌতম চক্রবর্তী

তর্কালঙ্কার উত্তর বঙ্গীয় সমাজ নিত্য সান্ধ্য আড্ডায় কিংবা অতীব মন্থর কর্মস্থলে চুলচেরা বিশ্লেষণ চালাচ্ছেন, তেইশ মে তরাই ডুয়ার্স কী রায় দেবে? 'এখন ডুয়ার্স' সে রায় নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়! কিন্তু পিছিয়ে থাকা এই প্রত্যন্ত বঙ্গে এবার ভোটদানের আস্বাভাবিক হার বিস্মিত করেছে আমাদের! কোন পুলকিত হরষে নির্বিকারত্ব প্রাপ্ত মানুষ দলে দলে এসে ভোট দিল সেটাই সরেজমিনে দেখে এসে আজকের এই প্রতিবেদন! এবারের ডুয়ার্স পরিক্রমায় তবু কি অনেক কিছুই অজানা প্রশ্নের মত রয়ে গেল?

শান্ত বাজারটা পেরিয়ে গেলে ওপারে ভুটান। আপাতভাবে শান্ত আগাগোড়াই। দিনের বেলা ট্রাকের চাকায় ওড়া ধুলোয় ঢেকে থাকে বাজারটা। তবে এক পশলা বৃষ্টি হলেই কয়েকঘণ্টা চারিদিক পরিষ্কার। তখন যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা ভুটানের নীল পাহাড়ের সারি। ভুটান সীমান্তের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা লঙ্কাপাড়া সহ ওই এলাকার গোটা চা বলয়ের সঙ্গে অবশ্য চিরকাল ভুটানের 'দিল কা রিস্তা'। দিন আনি দিন খাই গোছের জীবনযাপনে অভ্যস্তদের মত অনেকেই যেমন জলের জন্য ভুটানের উপর নির্ভরশীল, তেমনি নির্ভরশীল ভুটানি সিম কার্ডের ওপর। তবে ভুটান ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র হওয়ার ফলে পাহারায় তেমন কড়াকড়ি নেই। সীমান্তের ওপারে তো বটেই, এপারে লঙ্কাপাড়াতেও মোবাইলে বিন্দাস মেলে ভুটানি কোম্পানির টাওয়ার। সীমানার ওপারে গেলে রাতে ফিরে লঙ্কাপাড়ার বাজারে হোটেলে খানাপিনা। ভোট এলেই ভুটান সীমান্তঘেঁষা লংকাপাড়া বাগানে একটা চর্চা হয় যে ওই এলাকার ভাইলোগেরা নাকি যার হাতে থাকে তাদেরই ভোট হয় লংকাপাড়ায়। সেটা বাম এবং অবাম উভয় জমানাতেই। ভোটপর্ব শেষ হতেই বেরিয়ে পড়েছি তরাই এবং ডুয়ার্স পরিক্রমায়। না, কে জিতবে কে হারবে তার সুলুক সন্ধান করতে নয়। সুলুক সন্ধান করতে এসেছি সেইসব মানুষ বা গোষ্ঠী বা জনজাতির সমস্যা যাদের কেউ নেই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে পাশে দাঁড়ানোর। পরিসংখ্যান বলছে বিগত দিনে একচেটিয়াভাবে ভোট দিয়েছে লঙ্কাপাড়া সহ লাগোয়া বাসিন্দারা বাম জমানায়। বামফ্রন্টের প্রভাব ছিল লঙ্কাপাড়ায়। ছিল আরএসপির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য। তৃণমূলের আমলে ২০১৩ সালে লঙ্কাপাড়ার বোর্ড দখল করে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। পরে অবশ্য দলবদলের জেরে বোর্ড দখল করে তৃণমূল। রাজনীতির মোড় ঘুরে যায় তখন থেকে। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লঙ্কাপাড়ার বোর্ড দখল করে তৃণমূল। বাহুবলি জামা পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে নাকি পাল্টে যায় লঙ্কাপাড়া। রাজনৈতিক সমীকরণ পাল্টে যায় ব্লক জুড়ে।

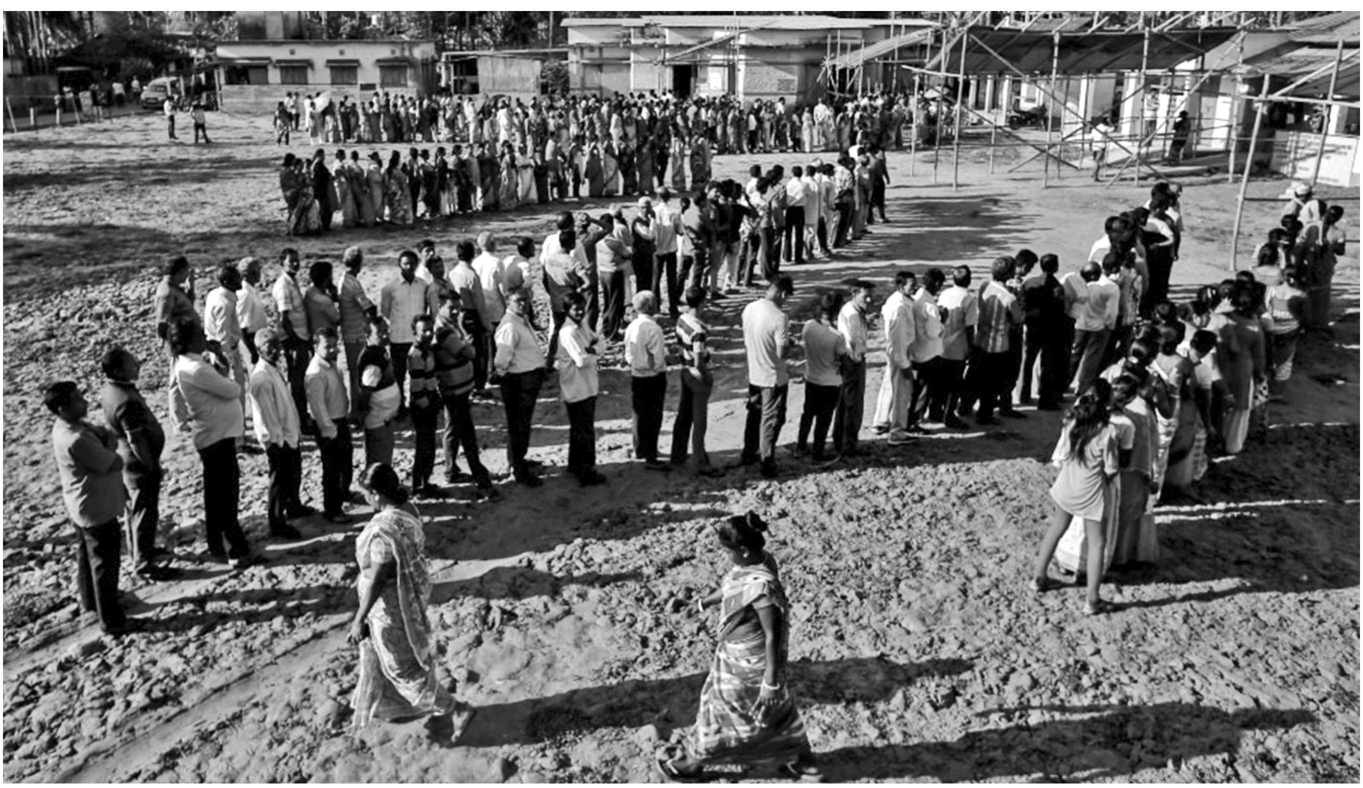

আপাত শান্ত লঙ্কাপাড়ায় তাই সাধারণ চা শ্রমিকদের দিন কাটে আর অন্যান্য দিনের মতোই। তবে সন্ধে হলেই লঙ্কাপাড়ায় জেগে ওঠে অন্যরকম লোকজন। টেবিল পেতে ফেনিল পানপাত্র আর ডানহাতে মোবাইল নিয়ে পাওনাগন্ডার হিসাব কষে বাহুবলী লোকজন। হঠাৎ করেই যেন পাল্টে গেছে লঙ্কাপাড়ার চালচিত্র। কিছুদিন আগেও লঙ্কাপাড়ায় যাদের রাজ চলত তারা এখন শ্রীঘরে। গত বছরে মাফিয়াদের গুলিতে জোড়া খুন হয় লংকাপাড়ায়। তখন লঙ্কাপাড়ায় এসেছিলাম ডানকানসের বাগানগুলি নিয়ে সার্ভে করতে। বীরপাড়া প্রশাসন আমাকে লংকাপাড়া ঢুকতে দেয় নি। খুনের ঘটনায় জড়িতদের ধরতে সেইসময় লঙ্কাপাড়ায় অপারেশন থান্ডার চলে। চলতি বছরের চৌঠা জানুয়ারি কার্বি আংলং জেলা থেকে ধরা হয় প্রায় সমান্তরালভাবে প্রশাসন চালানো বেশ কিছু বাহুবলিকে। তল্লাশি চালিয়ে তুলসীপাড়া এবং রামঝোড়া চা বাগানের বিভিন্ন বস্তি থেকে উদ্ধার করা হয় একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র। ভাইলোগদের কাছে লঙ্কাপাড়া বরাবর সোনার খনি। পাগলি ভুটান থেকে ডলোমাইট বোঝাই করে লঙ্কাপাড়া হয়ে বীরপাড়া যায় সারি সারি ট্রাক। বছর দেড়েক আগে শুরু হয় ১৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোড পুনর্নির্মাণের কাজ। নির্মাণ সামগ্রীর দোকান থেকে শুরু করে তোলা আদায় সবদিক থেকে লাভের গুড় খেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নানা মাপের মাফিয়ারা। লঙ্কাপাড়া হয়ে যায় শুটআউট জোন। শুটআউট কাণ্ডের পর ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে জেলা পুলিশ জানিয়েছিল তোলাবাজির বখরার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছিল। জোড়া খুনের ঘটনা লঙ্কাপাড়ার কাঁচা টাকার উৎসকে সর্বসমক্ষে নিয়ে এসেছে। লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে যাওয়ার মত তৈরি করেছে একের পর এক মাফিয়া। শান্ত ছেলেটো চোরাচালানে হাত পাকাতে পাকাতে কোমরে পিস্তল গুঁজে কখন হয়ে উঠেছিল ভাই সেটা সম্ভবত নিজেও টের পায়নি। এদের সঙ্গে যোগ দেয় তুলসীপাড়া চা বাগানের একাধিক টগবগে তরুণ যারা অব্যর্থ নিশানায় গুলি ছুড়তে ওস্তাদ। পুলিশের খাতায় নাম উঠে যায় কারোর কারোর। একের পর এক নথিভূক্ত হতে থাকে খুন-জখম, তোলাবাজি, বেআইনি অস্ত্র রাখার অভিযোগ। এলাকার অনেকেরই অভিযোগ খেটে খাওয়া পরিবারের ছেলেদের হাতে অস্ত্র উঠে আসার পেছনে যেমন দায়ী রয়েছে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য, বাগান বন্ধ হয়ে যাবার মতো ঘটনা, তেমনি রয়েছে রাজনৈতিক মদত। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল লঙ্কাপাড়ায় তোলাবাজির শেকড় অনেকদূর বিস্তৃত। তোলাবাজির অন্যতম পান্ডারাই বড় বড় মাফিয়াদের রাজনৈতিক অঙ্গুলিহেলনে শুটআউটের শিকার হয়েছে এ রকমই অভিযোগ। তবে বেআইনি কাজে মদত দেওয়ার অভিযোগ প্রত্যাশিতভাবেই উড়িয়েছে সব রাজনৈতিক দলগুলি। জানিয়ে দিয়েছে শুটআউট কাণ্ডের সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগাযোগ নেই। বাসিন্দারা ভোট দেওয়ার আনন্দটা এবার উপভোগ এজন্যই করতে পেরেছে যে এলাকায় এই প্রথম ভাইলোগেরা ছিল না। ছিল ঘনঘন পুলিশি টহল। কোণঠাসা ছোট ছোট ভাইলোগেরা এবার ভোটের দিন ফিল্ডে ছিল না। তবে হ্যাঁ। কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম বাজারের মিষ্টির দোকানদারের সঙ্গে। সরাসরি জবাব আমি কিছু জানিনা। কিছু বলতে পারব না। এরপর এগিয়ে গিয়েছিলাম যেখানে শুটআউট হয়েছিল সেই শিরোনামে আসা হোটেলটার দিকে। মুখ খুলতে রাজি হননি হোটেলের মালকিন। পিনে কা পানি মিলেগা? বিলাতি মদের খালি বোতলে ভরা ঝকঝকে জল এগিয়ে দিয়েছিলেন মহিলা। কিন্তু কিছুদিন আগে হলে এই জলটাও পেতাম না।

শালকুমার রাভাবস্তিতে

একদিকে বনবস্তি থেকে উচ্ছেদের আশঙ্কা, অন্যদিকে অনুন্নয়ন- এসবকে ভোটের ইস্যু করেছিলেন আলিপুরদুয়ারের শালকুমারহাট রাভাবস্তির বাসিন্দারা। তাদের অভাব অভিযোগের অন্ত নেই। তাদের বক্তব্য, যারা ক্ষমতায় থাকেন তারাই রাভাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু রাস্তাঘাট, পানীয়জল, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের অভাব, সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাদের মধ্যেও। এসব অভিযোগ যদি থাকে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে তাহলে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বনবস্তি থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ তাদের কিছুটা হলেও বিজেপি বিরোধী করে তুলেছে। ওদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টাতেই আদালতের রায়ের ওপর সাময়িক স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে বলে তাদের অনেকেই মনে করে বিজেপি ক্ষমতায় আসা প্রয়োজন। তবে অভাব অভিযোগ কিছু থাকলেও রাভারা যে খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন তা মানতে চাননি শাসক দলের প্রতিনিধিরা। তাদের পাল্টা দাবি বিজেপি সরকার চাচ্ছে তাদেরকে বস্তি থেকে সরাতে। তাদেরকে যেন উচ্ছেদ না হতে হয় সেই দাবিতে এবং তাদের অভাব-অভিযোগ এবং সমস্যা সমাধানের দাবি তুলেছেন রাভারা এবং এসবের নিরিখেই এবার ভোট দিতে গিয়েছিলেন শালকুমার হাট এর জলদাপাড়া সাউথের চারদিকে জঙ্গলঘেরা রাভাবস্তির বাসিন্দারা। বস্তিতে রয়েছে ৮৩ টি পরিবার। লোক সংখ্যা প্রায় ৫০০। এখনও নেই এর রাজ্যে বসবাস করছেন তারা। দু'বছর আগে বন্যায় ভেঙেছে বস্তিতে যাওয়ার কাঠের সেতু। বারবার আবেদন জানালেও সেতু তৈরি হয়নি। বস্তিতে নেই পানীয় জলের পরিষেবা। একমাত্র প্রাইমারি স্কুলটি পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। হাইস্কুল পুড়ে যাবার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রগতি নেই। কর্মসংস্থানের অভাবে এখনও বস্তির প্রায় ৮০ জন বাসিন্দা ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করছেন। ভোট এলেও তাদের অনেকেই বাড়িতে ফেরেন নি। অভিযোগ, বন-জঙ্গলকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন প্রসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলেও এতদিন পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কেউই এবং বনদপ্তরের ১০০ দিনের প্রকল্পে পর্যাপ্ত কাজ মেলে না। বস্তিতে নেই কোনও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র। যাতায়াতে দারুন সমস্যা হয়। বর্ষার জলকাদায় জঙ্গলে বন্দী হয়ে থাকতে হয়। বস্তিতে কাজের অভাব বড় সমস্যা।

মেচবস্তির ভোটকাহন

কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে ছবির মত সুন্দর গ্রাম মেচবস্তি। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী প্রাকৃতিক শোভা বাড়িয়েছে এই গ্রামটির। গ্রামটি যতই সুন্দর হোক না কেন, এখানকার মানুষেরা নিজেদের অবহেলিত বলে মনে করে থাকেন বলে ভোট নিয়ে আগ্রহ ছিল না মেচ বস্তির বাসিন্দাদের। কারণ সরকার আসে এবং সরকার যায়, কিন্তু মেচবস্তি যেন চিরকাল অবহেলিত থাকে। উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত সমগ্র মেচবস্তি। সর্বত্রই রাস্তাঘাটের দৈন্যদশা। নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এখানকার বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের বক্তব্য তারা যেন নেই রাজ্যের বাসিন্দা। কাঁচা রাস্তা বর্ষাকালে চরম আকার ধারণ করে। নদী পারাপারের জন্য পাকা সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। না হওয়ার ফলে তাই বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েত থেকে বানানো বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এলাকায় পানীয় জলের প্রচন্ড সমস্যা। পঞ্চায়েত থেকে গভীর নলকূপ বসানো হলেও তা থেকে আয়রন যুক্ত জল বের হয়। সেই জল খেতে বাধ্য হয় মেচবস্তির বাসিন্দারা। মেচবস্তির পাশেই রয়েছে আপালচাঁদ বনাঞ্চল। প্রায়দিন হাতির উৎপাত লেগেই থাকে। গ্রামবাসীদের অধিকাংশই শ্রমিকের কাজ করেন। রাস্তায় কোনও আলোর ব্যবস্থা না থাকার ফলে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে রাতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হয় তাদেরকে। গ্রামে নেই কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয় কিংবা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। খুদে পড়ুয়াদের তিন কিলোমিটার হেঁটে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে হয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকার ফলে সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদেরকে দারুন সমস্যায় পড়তে হয়। ভোটের সময় সব দলের নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও সমস্যার সমাধান হয় না। ভোটে যে দলই জিতুক না কেন, গ্রামের মানুষের কোনও কিছুই যায় আসে না। সেইজন্য ভোট নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না এবার। যদিও সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী জানা গেছে ভোট দিয়েছে মেচবস্তি।

দুর্গম বক্সা পাহাড়ে

বক্সা পাহাড়ের দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে কোন রাজনৈতিক দলকে প্রচারে দেখা না গেলেও নাগরিক হিসেবে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ করতে কোনও কার্পণ্য ছিল না এখানকার বাসিন্দাদের। এই বিশেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেন পাহাড় এবং জঙ্গলঘেরা এই এলাকার ভোটাররা। ভোট দেওয়ার জন্য এলাকার সহজ সরল মানুষগুলির মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। রাজ্যের চারিদিকে রাজনৈতিক দলগুলির ভোটপ্রচারে এক রাজনৈতিক কলহের মেজাজ তৈরি হয়। এর ঠিক উল্টো ছবি দেখা গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত বক্সা পাহাড়ে। বক্সা পাহাড় জেলা শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে। ওই এলাকায় গিয়ে বোঝা গেল সরকারের কাছে দীর্ঘদিনের অনেক চাওয়া-পাওয়া রয়েছে এলাকার মানুষের। কোথাও কোথাও পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে অথবা রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থানের কোনও দিশা এরা এখনও খুঁজে পাননি। পশুপালন করে, কোথাও আবার পাহাড়ের ঢালে আদা এবং লঙ্কা আর কুমড়ো চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন অনেকেই। তাছাড়াও ভুটানে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালান এলাকার বহু মানুষ। এখনও এখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই। এসব অভাব সত্ত্বেও সারাবছর এই এলাকায় শান্তি থাকে। বড় কোনও অশান্তির খবর শোনা যায় না বললেই চলে। সেটাই ধরে রাখতে চান শান্তিপ্রিয় এই এলাকার মানুষ। সড়কপথে বক্সা পাহাড়ে ২৮ বস্তি হয়ে যেতে হয়। এখানে মূলত নেপালি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস। এলাকার মানুষ বরাবর শান্তিপ্রিয়। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন হয়নি। রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং বিদ্যুতসহ কিছু উন্নয়ন হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ার ফলে রাজনৈতিক দলের বড় নেতারা এখানে সেভাবে প্রচারে আসেন না। কিন্তু ভোট নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। আঠাশ বস্তি থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে সান্তালাবাড়ি। এখানে একটা বাজার রয়েছে। মঙ্গলবার করে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। বক্সা পাহাড়ের লোকজন নেমে এসে এখানে বাজার করে। এবারে সান্তালাবাড়িতে

একটা নতুন বুথ হয়েছিল। এলাকার ভোটারেরা সেখানে ভোট দিয়েছেন। স্থানীয় জেমস ভুটিয়া বলেন, নতুন এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হবার ফলে এলাকায় খুশির হাওয়া লক্ষ্য করা গেছে। এর আগে বক্সা রোড প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে ভোট দিতে হত। ফলে সারাদিন নষ্ট হত। তার উপর হাতির হামলার ভয় ছিল। এখানে সেই ভয় নেই। সান্তালাবাড়ি থেকে দুর্গম হাঁটাপথে বক্সা পাহাড়। সেখানে ১৪ টা পাহাড়ি গ্রাম রয়েছে। বক্সা পাহাড়ে তিনটে বুথ রয়েছে। এগুলি হল আদমা, চুনাভাটি এবং বক্সা ফোর্ট। প্রতিবছর সকাল সকাল সেখানে ভোটের লাইনে দেখা যায় এলাকার মানুষদের। সরকারি উদ্যোগে এই পাহাড়ে বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল অনেক এলাকায় পৌঁছে গেছে। তবে এখনও বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে সমতলের মত উত্তেজনা নেই এলাকায়। প্রায় ১২০০ ভোটার রয়েছেন এই এলাকায়। ভোট দেওয়ার জন্য এলাকার মানুষ সকলেই আগ্রহী ছিল।

পড়াশুনার দাবিও উপেক্ষিত?

দুই দশকেও কলেজ হয়নি। বারবিশায় কলেজ স্থাপনের দাবি দুই দশকের পুরনো। কিন্তু এই দাবি পূরণ হয়নি বলে লোকসভা ভোটের মুখে ভুটান সীমান্তের কুমারগ্রাম ব্লকে কলেজ স্থাপনের দাবিতে সরব হয়েছেন বাসিন্দারা। বারবিশাতে কলেজ স্থাপনের জন্য এলাকার মানুষ কুমারগ্রামে জমি কিনে রেখেছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তর সহ সমস্ত জায়গায় কলেজ স্থাপনের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা হলেও কলেজ স্থাপন হয় নি। কুমারগ্রাম ব্লকে একটিমাত্র কলেজ রয়েছে কামাখ্যাগুড়িতে যে কলেজের ওপরে ছাত্র-ছাত্রীদের চাপ অত্যন্ত বেশি এবং এই মুহূর্তে কামাখ্যাগুড়ি কলেজে প্রায় ৬০০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শ্রেণিকক্ষের অভাবে পরীক্ষার সময় বিভিন্ন স্কুলের কাছে ঘর চেয়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় কলেজ কর্তৃপক্ষকে। ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা কুমারগ্রাম চা বাগান এবং নিউল্যান্ডস চা বাগান। তাছাড়া বিভিন্ন বস্তি এলাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে যাতায়াত করতে অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ এইসব এলাকাগুলি থেকে কামাখ্যাগুড়ির দূরত্ব ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। তাই আর একটি কলেজ স্থাপন হলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে এলাকার শিক্ষানুরাগীদের দাবি। কুমারগ্রাম ব্লক ছাড়াও আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লক এবং কোচবিহার জেলার বেশ কিছু এলাকার ছাত্রছাত্রীরা কামাখ্যাগুড়ি কলেজের উপরে নির্ভরশীল। রাজনৈতিক দলগুলিও কলেজ স্থাপনের দাবিতে সহমত পোষণ করেছে।

কলেজের দাবি নাগরাকাটাতেও?

জলপাইগুড়ি জেলার সব ব্লকে কলেজ থাকলেও নাগরাকাটাতে কলেজ নেই বলে প্রত্যেক বছর বারোশোর বেশি উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের কলেজে ভর্তি হতে হিমশিম খেতে হয়। এই পড়ুয়াদের বেশিরভাগই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে। এবারের লোকসভা ভোটে নাগরাকাটায় ভোটারদের মূল ইস্যু হিসেবে তাই উঠে এসেছে কলেজ স্থাপনের বিষয়টি। বিষয়টিকে সমর্থন জানিয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং তাদের এই দাবির সঙ্গে পূর্ণ সহমত পোষণ করেছে জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একটি করে কলেজ তৈরি রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। নাগরাকাটা শুধুমাত্র একটি ব্লক নয়, বিধানসভা কেন্দ্র। প্রতিবছর এখান থেকে যারা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয় তারা আশপাশের কলেজে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হয়। তাদেরকে কুড়ি কিলোমিটার দূরের মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয় কিংবা ২২ কিলোমিটার দূরের বানারহাট এর কার্তিক ওঁড়াও সরকারি কলেজ- এই দুটি ভরসা। এর মধ্যে প্রথমটি ছাত্রদের ভারে জর্জরিত এবং দ্বিতীয়টিতে আসন সংখ্যা অতি স্বল্প। এই পরিস্থিতিতে ভোটের আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে কলেজ তৈরির জোরালো দাবির কথা উঠে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে এলাকার নানাস্তরের বাসিন্দা এবং শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিধায়ককে সভাপতি করে গঠন করা হয় কলেজ অর্গানাইজিং কমিটি। জেলার প্রান্তিক এলাকা বলে পরিচিত নাগরাকাটাতে একটা কলেজ যে অত্যন্ত প্রয়োজন তা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতারাই।

ভোটের বাজারে বৈকুণ্ঠপুরের ৩০ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার দাবি তুলেছে। সেই সঙ্গে তাদের সারা বছরের খাবার যাতে বুনোদের পেটে না চলে যায় সেই ব্যবস্থা করে দেওয়ার নিশ্চয়তা চেয়েছেন তারা ভোট প্রার্থীদের কাছ থেকে। ভোট প্রচারে কোনও দলের প্রার্থী এলে তার কাছে এসব কথাই বলেছেন ১৫ টি বস্তির বাসিন্দারা।

সুখে নেই বনবস্তির মানুষেরাও

সর্বোচ্চ আদালত বস্তির বাসিন্দাদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া শেষ করতে নির্দেশ দিলেও আপাতত স্থগিত আছে। বস্তির বাসিন্দারা অবশ্য তাতে বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত নয়। বরং উচ্ছেদের আতঙ্ক গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া তিনটি বস্তির প্রায় হাজারখানেক বাসিন্দাকে সারাক্ষণ ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েই এলাকার ভোটারদের মন জয় করে বাজিমাত করতে চাইছে। মেটেলির বাতাবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জঙ্গললাগোয়া বামনিতে বাসিন্দা প্রায় এক হাজার। দীর্ঘদিন ধরে বাম শাসনের পর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই এলাকা তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসে। ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও এখনও পর্যন্ত এলাকার তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। রাস্তাঘাট বা পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলের অভাবে বাসিন্দারা প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়ছেন। গরম পড়তে বেশিরভাগ পুকুর নদী এবং ঝোরা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যে কটি নলকূপে সামান্য জল রয়েছে সেগুলির জল খাওয়া যায় না। বাসিন্দাদের এইসব সমস্যা নিয়ে কোন দল আন্দোলন করে না বলে তাদের অভিযোগ। বর্তমানে উচ্ছেদ আতঙ্কে তাঁরা ভুগছেন বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। ঠিক একইরকমভাবে আঁধার কাটেনি কালামাটি বনবস্তিতে। ভোটের প্রচারেও উন্নয়নের আভাস নেই। রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ এবং ২০ নম্বর বুথের অন্তর্গত কালামাটি, বুধুরাম, কালিপুর সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষজন ভোট নিয়ে আগ্রহ হারিয়েছে। রাস্তাঘাট, পানীয়জল, বিদ্যুৎ সহ নানান সমস্যায় জর্জরিত এই এলাকার মানুষ। রাতবিরেতে অসুস্থ কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। খারাপ রাস্তার কারণে কোনও গাড়ি এলাকায় আসতে চায় না। কালামাটি বস্তির চেংমারী এলাকায় বিদ্যুতের সমস্যা সবচেয়ে প্রকট। কালামাটি বস্তির প্রায় ২৫ টি পরিবার বিদ্যুৎহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। বছর কয়েক আগে গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। কিন্তু কয়েকবছর আগে বিদ্যুতের বকেয়া বিল পরিশোধ না হওয়ার ফলে লাইন কেটে দেওয়া হয়। বছরের ১২ মাসই তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় কাটে। প্রতিবার তারা সমস্যা মেটার আশায় বুক বাঁধেন, কিন্তু আবার ভোট আসে এবং ভোট যায়। কিন্তু এলাকায় কোনও পরিবর্তন হয় না।

গজরাজের হানাদারি বৈকুণ্ঠপুরে

বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের মালিভিটা, মান্তাদাড়ি, শিমুলবাড়ি, বোঁদাগঞ্জ এর মত বনবস্তির বাসিন্দাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে হাতির দল। রাতবিরেতে হানা দেয় বুনো হাতির দল। ঘরের দেয়াল ভেঙে ঘরে থাকা চাল এবং সবজি খেয়ে যায়। আবার কখনও কখনও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলানো ধান, ভুট্টা, সবজির খেতে প্রবেশ করে ফসল খেয়ে নিচ্ছে। ফসল এভাবে বুনোদের পেটে চলে যাওয়া তবুও মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু বুনো হাতির পায়ের তলায় যখন পিষে যায় ওদের পরিবারের কেউ কেউ বা কাউকে যখন বুনো দাঁতাল শুড়ে তুলে আছাড় মারে এবং তিনি চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে যান তখন ব্যাপারটা সত্যিই ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সন্ধ্যার পর গভীর বনাঞ্চল সংলগ্ন বস্তিগুলিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। ভোটের বাজারে বৈকুণ্ঠপুরের ৩০ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার দাবি তুলেছে। সেই সঙ্গে তাদের সারা বছরের খাবার যাতে বুনোদের পেটে না চলে যায় সেই ব্যবস্থা করে দেওয়ার নিশ্চয়তা চেয়েছেন তারা ভোট প্রার্থীদের কাছ থেকে। ভোট প্রচারে কোনও দলের প্রার্থী এলে তার কাছে এসব কথাই বলেছেন ১৫ টি বস্তির বাসিন্দারা। মালিভিটা বস্তির বাসিন্দা হরি বাহাদুর ভুজেল বলেন, রাস্তাঘাট ভাঙ্গা। বনবস্তির কোনও রাস্তায় আলো নেই। কাঠের সেতুগুলি ভেঙে পড়েছে। রাতে বুনো হাতির আক্রমণ হলে পালানোর পথ পাই না। সোলার লাইট এর দাবি জানানো হয়েছিল। সেটাও পাওয়া যায়নি। ওমপ্রকাশ রাই এর মতে, আগে ধান এবং পাট চাষ করা হত। এখন চায়ের আবাদ করা হয়। ক্ষুদ্র চা বাগান থেকে কাঁচা চা পাতার দাম পাওয়া যায় না। কিন্তু ফসল পুরোটাই বুনোদের পেটে চলে যায়। জঙ্গলের পথে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা কুড়ি কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে স্কুলে

যায়। বনবস্তি সংলগ্ন তিস্তা ব্যারেজ। তবুও সারা বছর সেচের জল পাওয়া যায় না। মানিকাঝোরা যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সভাপতি কালু রায় জানান, ৩৬৫ দিন তাদের বুনো হাতির উপদ্রবের শিকার হতে হয়। বনাঞ্চলে খাবারের অভাব হতে এই অবস্থা। বনবস্তি এলাকার অন্যতম বড় সমস্যা হল হাতি। বছরের বেশিরভাগ সময় হাতি এলাকায় হানাদারি চালায়। মাঠের ফসল সাবাড় করে, ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। বিভিন্ন সময় বন্যপ্রাণীর হামলার মুখে পড়ে এখানকার বাসিন্দারা বড় সমস্যায় পড়েছেন। তা সত্বেও বাসিন্দারা এখানে কোনমতে তাদের আস্তানা আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। একদিকে যেমন বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে জীবন কাটাতে হয়, তেমনি প্রতিদিন চলে অন্নসংস্থানের জন্য লড়াই। এর মধ্যে বিদ্যুতের সমস্যায় দুর্ভোগে পড়েছে এলাকার মানুষ। বিকেল হলেই ঘরবন্দী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকছে না তাদের। বাড়ির উঠোনে হাতির আগমন রোজকার ব্যাপার। এইসব বনবস্তিগুলি রাজগঞ্জ বিধানসভার অধীন।

সম্ভাবনা প্রচুর, তথাপি বড়ই দুঃখী উত্তরের কৃষিবলয়

এ সময় ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি থেকে শিলিগুড়ির দিকে যদি যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে দু পাশের মাঠে বস্তা বস্তা আলু পড়ে আছে। এই সব বস্তার কবে হিমঘরে জায়গা হবে কোনও নিশ্চয়তা নেই। কেন নেই? কে জবাব দেবে? প্রার্থীদের কাছে কোনও জবাব আছে? কৃষকের সমস্যা মেটানোর নির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি নেই। কৃষকের গোটা জীবনটাই কষ্টের। ফসল হবে কি না, হলে লাভজনক দামে বিক্রি হবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন আসামে বনধ হলে বা অন্য কোন কারণে সেখানকার পাইকারি বাজার বন্ধ থাকলে তুফানগঞ্জ বা বকসিরহাটের বাজারে সবজি ব্যবসায়ীরা সবজি ফেলে দিয়ে চলে যান। এই উত্তরবঙ্গে ফল বা সবজি সংরক্ষণের জন্য কি পর্যাপ্ত হিমঘর আছে? জানেন কি সাংসদ পদপ্রার্থীরা? প্রশ্ন তুলেছেন তুফানগঞ্জের চাষী অনিল বর্মণ। অনিলবাবুর ছেলে কিন্তু কোচবিহার কৃষি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। অনিলবাবুর মত অনুসরণ করে ফালাকাটার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বলেন, রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে এই সমস্যা গুরুত্ব পায় না এবং সেই সমস্যা সমাধানের পথ রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে গুরুত্ব না পেলে সেখান থেকেই অনুন্নয়ন প্রশ্রয় পেতে শুরু করে। দারিদ্র্য এবং অপুষ্টির অন্ধকার দীর্ঘায়িত হয় যা মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে থেকে যায়। তিনি রোদে রোদে ঘুরে বিভিন্ন সভায় রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান যখন দিচ্ছেন তখন তাঁর কাছে কোনওরকম খবর পৌঁছায় না যে সেইসব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিচতলা পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে কিনা। আসলে গ্রামে বসবাস না করলে অথবা গ্রামে গ্রামে না ঘুরলে বোঝা যায় না দারিদ্র্যের অন্ধকার কতদূর প্রসারিত। ১০০ দিনের কাজ পাবেন কিনা তা ঠিক করে দেন নেতা। কাজ দেওয়ার আগে জেনে নেওয়া হয় বুকের ভিতর কোন রঙের পতাকা তিনি বয়ে বেড়ান। সাধারণত ১৪ দিনের কাজ দেওয়া হয় এবং তার জন্য ২৪০০ টাকার মত পাওয়া যায়। এই টাকা থেকে কত টাকা সুপারভাইজারকে দিতে হবে সেটা আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে। কারণ টাকা দিলেই কাজ। তাই কর্মদিবস বাড়িয়ে দেখানোর নামে গ্রামে গ্রামে এক ধরনের চক্র তৈরি হয়েছে। একবার যিনি কাজ পাচ্ছেন তিনি বারবার কাজ পাচ্ছেন। কেউ কেউ মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন। অনেকে হতাশায় চিৎকার করে ফেলছেন। যেমন মাদারিহাট ইয়ুথ হোস্টেলের সামনে দাঁড়িয়ে এক রমণী চিৎকার করে বলছিলেন, গতবছর তিনি একদিনও কাজ পাননি। এবছর এখনও একদিনও কাজ জোটেনি। অথচ হাটে হাটে ঘুরে আলু পেঁয়াজ বিক্রি করে তাঁর আর সংসার চলছে না। এইভাবে গ্রামে গ্রামে গরিব মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আগে যে গরিবের লড়াই ছিল জমিদারের বিরুদ্ধে, এখন সেই গরীব মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে। লড়াইয়ের সূত্রপাত ক্ষমতার অলিন্দে। সেখানেই ঠিক হয়ে যায় কে কোন পক্ষে আর তার জন্য পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকা জরুরি।

ভোটের মরশুমে যেখানেই গেলাম না কেন, বা যে কোনও হোটেল বা চায়ের দোকানে আড্ডায় বসি না কেন, কোনও না কোনও মহাপুরুষের গল্প শুনতে পেলাম। সে ভোটপট্টি হোক বা জামালদহ হোক অথবা মাথাভাঙ্গা হোক কিংবা দেওয়ানহাট হোক অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র বা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সর্বত্রই তোলাবাজি এবং কাটমানির বিপুল বন্দোবস্তের অভিযোগ। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুঠের গল্প মানুষের

জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনে চা বাগানের ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে এই লোকসভা আসনে জাতিসত্তার বিষয়টাও এবারের ভোটে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

মুখে মুখে। আর একটা অদ্ভুত ভয় আর সন্দেহের বাতাবরণে মানুষ মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে। অদ্ভুত ধরণের চুপচাপ। কেন? কারণ জানতে চাইলাম মাথাভাঙ্গার মিষ্টির দোকানের মালিককে। চারপাশে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলে উঠলেন "মাথা খারাপ আপনার, বউ-বাচ্চা নিয়ে সংসার করি। এখনও এক মেয়ের বিয়ে দেওয়া বাকি আছে"। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল পেছনে টেবিলে বসে যে দুজন যুবক পরোটা তরকারি এবং রসগোল্লা আর চা খাচ্ছিল সে শাসক দলের সমর্থক। অতএব তার গলার স্বর আরও নিম্নগামী। গলার স্বর আরও নামিয়ে দিয়ে বললেন, সর্বত্র সামাজিক আধিপত্য কায়েম-এর প্রতিযোগিতা দাদা, ব্লকের নেতা হোক, অথবা রাজ্যের নেতা সবাই প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাশালী। কোন বাড়ির ছেলের সঙ্গে কোন বাড়ির মেয়ের বিয়ে হবে, সম্বন্ধ করে বিয়ে নাকি প্রেমের বিয়ে, হিন্দু ছেলে মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে কিনা সবকিছু নেতাকে জানাতে হবে। প্রেমের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর গোলমাল হলে দু তরফ থেকেই পয়সা আদায়।

জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার লোকসভা আসনে চা বাগানের ভোট নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে এই লোকসভা আসনে জাতিসত্তার বিষয়টাও এবারের ভোটে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রে আদিবাসী বিকাশ পর্ষদের পাশাপাশি গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার চা বাগানে মজদুর ইউনিয়ন আছে। কংগ্রেস অনুমোদিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স আছে। তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন বাগানে ইউনিয়ন রয়েছে। নিজেদের কোন শ্রমিক সংগঠন না থাকলেও গেরুয়া শিবির প্রায় দু বছর আগে চাবাগানগুলিতে আরএসএসের স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠিয়ে বিজেপির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করতে বাকি রাখেনি। এত সংগঠন থাকলেও ন্যূনতম মজুরি চুক্তি না হওয়ার ফলে সাধারণ চা শ্রমিকেরা আগের মত শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর ভরসা রাখতে পারছে না। চা বাগানের সংগঠিত ভোটের ক্ষেত্রে বামপন্থীরা এখন আর সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। বিশেষজ্ঞদের ধারণা বাগিচার সংগঠনগুলির বর্তমান শক্তির ভিত্তিতে ভোট ভাগাভাগি হবে। পাশাপাশি জাতিসত্তার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। আসলে ভোটের মরশুমে আদিবাসীদের কথা আসছে। কারণ ভোটের মরশুমে আদিবাসীদের কদর বেড়ে যায়। এমন বেশকিছু লোকসভা আসন রয়েছে যেখানে আদিবাসীদের মতদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই বোধহয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাপের নেত্রীকেও জন বারলার মত অকিঞ্চিৎকর নেতাকে আক্রমণ করতে হয়। এমনিতেই সারা বছর আদিবাসীরা এত গুরুত্ব পান না। পরিসংখ্যান বলছে অন্য রাজ্যের আদিবাসীদের তুলনায় এই রাজ্যের আদিবাসীরা যেমন সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য, এবং কৃষিমজুরের নিরিখে পিছিয়ে রয়েছেন, তেমনি অন্য অনেক সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। যদি গোটা দেশের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে সাধারণ শ্রেণীতে সাক্ষরতার হার যেখানে ৭৩ শতাংশ সেখানে তপশিলি উপজাতিদের সাক্ষরতার হার ৫৯। আর সাক্ষরতার বিচারে তপশিলি উপজাতিরা আমাদের রাজ্যে আরও পিছিয়ে। তাই সাক্ষরতার নামে এতদিন ধরে এই রাজ্যটার হচ্ছেটা কি? নাকি তাদের অন্ধকারে ফেলে রাখাটা একটা পরিকল্পিত সামাজিক প্রক্রিয়া। এমন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন সামাজিক অর্থনৈতিক সূচক এর বিচারে বেশ কয়েকটা ক্ষেত্রে আদিবাসীরা পিছিয়ে রয়েছে। ভোটের সময় এইসব কথা ওঠে। কারণ এই বাজারে ভোটের দাম কম নয়।

তবু মানুষ ভোট দিয়েছে ডুয়ার্স জুড়ে, আশাতীত সংখ্যায়। বিগত পক্ষকাল ধরে চষে বেড়িয়েছি জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। বোঝার চেষ্টা করেছি এত মানুষ কীসের আশায় ভোট দিল? ধর্ম, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদী জিগির? হাত উপুড় করা অনুদান রোটি, কাপড়া আউর মকানের চাহিদাকে আপাতত দূরে ঠেলে দিলেও সংসার চালাতে গিয়ে রোজগেরে মানুষ তো প্রতিনিয়ত বুঝতে পারে তাদের মৌলিক চাহিদা কতদূর পূরণ হয়েছে। শিল্প কারখানা এবং চাকরি-বাকরির কী ভবিষ্যত তা বুঝতে নিশ্চয়ই মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার প্রয়োজন নেই। আবার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে অভূতপূর্ব অর্থাগম প্রশাসনিক প্রশ্রয়ে যে কুইক মানি-র আমদানি করেছে তা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যে নয়া-রাজনীতিজীবি প্রজাতি, তারা এই ভোটারদের চোখ এড়িয়ে যাবে তাও ভাববার কোনও কারণ নেই। ধর্মের জ্যাকেট গায়ে চাপাতে বাধ্য হয়েছে সব দল, প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে— তাও মানুষ বুঝতে পারছে। কিন্তু সমস্যাটা হল মোবাইলে নয়া পয়সা ব্যয়ের ইন্টারনেট জালে আটকে মানুষ সব ভুলে শক্তিশালী অখণ্ড দেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিলেই অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা।

সাপুড়েরা সব হারিয়ে গিয়েছে দিনমজুরের দলে

প্রশান্তনাথ চৌধুরী

ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ ভূমিতে বহু বছর ধরে বন কেটে কৃষি, চা-বাগিচা ও জনপদ গড়ে উঠেছে। বন্যপ্রাণী বিপন্ন হয়েছে, তার চলাচলের পথ অবরুদ্ধ করা হয়েছে। তৃণভোজী প্রাণীর বংশ বিস্তার হয়েছে নিধনও হয়েছে প্রচুর অপর দিকে মাংসাশী হিংস্র প্রাণীর অস্তিত্ব সংকটে। এক সময় জলপাইগুড়ি শহরের পূব পাশে তিস্তার চরে হোগলা বনে হলুদের ওপর ডোরাকাটা বিশাল আকারের দক্ষিণা রায়ের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। বিগত শতাব্দির মধ্যভাগেও চা-বাগানের ইংরেজ ম্যানেজারকুল নাগাড়ে বাঘ নিধন চালিয়েছে শুধু নিজেকে জাহির করতে। ষাটের দশকেও মহুরিপাড়ার রসিক লাল দে মশাইকে দেখেছি বন্দুক হাতে নিহত বাঘের বুকে পা রেখে ছবি তুলতে। পুরসভার নির্বাচনে তাঁর ফেস্টুনে নিজের নামের পাশে বাঘাড়ু লিখতেন। বন্যপ্রাণ রক্ষায় আইন কঠোর হওয়ায় ঢাকঢোল পিটিয়ে পশু হত্যা বন্ধ হলেও আড়ালে আবডালে পোচিং চলতেই থাকল। দ্রুত নগরায়নের কারণে পশু, পাখি ও সরীসৃপ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। মফঃস্বল শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে এই সেদিনও সন্ধ্যাবেলায় শেয়ালেরা মিছিল করে পথ পরিক্রমায় বের হত। হুক্কা হুয়া ব্যান্ডে শহর মাত হয়ে যেত। জলপাইগুড়ি শহরে একটি পাড়ার নাম আদ্যিকাল থেকে শিয়াল পাড়া। পুরসভা নাম পরিবর্তন করে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির নামে রাস্তার নামকরণ করেছে, কিন্তু শহরবাসী শিয়ালপাড়া নামেই পরিচয় দিয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক শহরগুলো গাছপালা ঝোপঝাড়ে ভরা ছিল। বাড়ির কাছাকাছি জলাভূমিতে ডাহুক পাখি দেখা যেত প্রচুর। ভোরবেলায় প্রতিটি শহর জেগে উঠত পাখির কলকাকলিতে। ঝোপঝাড়ে সংসার পালন করত ভাম বা গন্ধগোকুল, বেজি, শেয়াল আর নানা প্রজাতির সাপ। ভাম এখনও প্রচুর দেখা যায় কিন্তু বেজি ও শেয়ালরা শহর ছেড়ে চলে গেছে। কিছু অবুঝ মানুষ শহরের মাঝে বাস করে আবার সমস্ত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে শূকর পালন করে। দিনের বেলায় পশুগুলো আটকে রাখলেও রাতে ছেড়ে দেয়া হয় শহরের পথে। সোয়াইন ফ্লু-র বাহক হওয়া সত্ত্বেও পুরসভা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে কোনও পদক্ষেপ নেয় না।

যে কোনও ধরনের সাপকেই অধিকাংশ মানুষ ভয় পায়। 'সাপে কামড় দিলে অব্যর্থ মৃত্যু' এমন ধারণা মোটেই বিজ্ঞান সম্মত নয়। সাপের কামড়ের ক্ষত স্থানের একটু উপরে হালকা বাঁধন দিয়ে সময় নষ্ট না করে হাসপাতালে আহতকে নিয়ে যাওয়া দরকার। সময়মত চিকিৎসা শুরু করলে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। একটা সময় ছিল যখন ইচ্ছে করলেই আহতকে হাসপাতালে পৌঁছনোর যানবাহন পাওয়া যেত না। তখন হাতুড়ে বা ঝাড়ফুঁক করার লোক ডেকে

আনা হত। পুরাতন কাব্যে বর্ণিত লক্ষ্মীন্দরের মত ভেলায় শুইয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার বিক্ষিপ্ত ঘটনা এখনও শোনা যায়। উত্তরবঙ্গের বন সংলগ্ন গ্রামে বা তার কাছাকাছি এলাকায় কিছু পরিবার জীবিকার তাগিদে সাপ ধরত, জড়িবুটি দিয়ে শুধু সাপে কামড়ানো রোগী নয় অন্য অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসা করত। সাপ বিক্রি করত, সাপের খেলা দেখাত এবং মহার্ঘ সাপের বিষ বিক্রি করত। অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করত।

বন সম্পদ ও বন্য প্রাণ রক্ষা সংক্রান্ত আইন লাগু হওয়ার পর সাপুড়েদের আদি পেশা বন্ধ হয়ে গেল। বহুদিন আগে গজলডোবায় এক বুড়ো মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, জেনেছিলাম তিনি একসময় সাপ ধরতেন এবং সাপের বিষ থেকে বাতের ওষুধ বানাতেন। তার ছেলেরা সাবেক পেশার সাথে যুক্ত নেই তাছাড়া সাপ ধরা যে সম্পূর্ণ বেআইনি সে ব্যাপারে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বড়গিলা গ্রামের নাকটানির বাড়ি এলাকার প্রায় তিনশ মানুষের বাস যাদের পরিবারের অগ্রজরা একসময় সাপুড়ে ছিল। ওরা বাস করত কোচবিহার জেলার হিন্দুস্থান মোড় এলাকায়। সাপ ধরা নিষিদ্ধ হলে পরিবারগুলো রোজগারের উদ্দেশ্যে আমগুড়িতে চলে আসে। এলাকাটা কৃষি সমৃদ্ধ হওয়ায় মজুরের কাজ পাওয়া সহজ ছিল। আলাপ করেছিলাম ওখানকার দীপু বাজিগর ও তেরু বাজিগরের সঙ্গে। কয়েক দশক পরেও ওই সব পরিবারের পুরুষরা কৃষি শ্রমিক, মহিলারাও অন্যের জমিতে শ্রম দেয় বা ১০০ দিনের কাজ করে মজুরি পায়। নিজেদের ভিটেটুকু ছাড়া চাষযোগ্য জমি নেই। এখনও এলাকার কারও বাড়িতে সাপ বের হলে ওদের খবর দেয়। ওরা বন দপ্তরের রামসাই অফিসে খবর দিলে এবং সঙ্গে সাপটি নিয়ে এলে অফিস থেকে একশ-দেড়শ টাকা পুরস্কার দেয়, সেই বাড়ির লোকরাও খুশি হয়ে পঞ্চাশ-একশ টাকা দেয়। ধৃত সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের এলাকার অধিকাংশ শিশুর পড়াশুনোর বালাই নেই। কাছে একটা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে কিন্তু কোনও সরকারি বিদ্যালয় নেই।

কিছু মহিলা স্বনির্ভর দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তারা প্রতি মাসে নিয়মিত মিটিং করে, নিয়মিত সঞ্চয় করে। দল থেকে প্রয়োজনে ধার পাওয়া যায়, অল্প সুদে তা শোধ করতে হয়। কিছু মহিলা এখন সই করতেও পারেন। ইদানিং সেই মহিলারাই শিশুদের স্কুলে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন, কষ্ট করে দূরের স্কুলে গেলেও বাচ্চারা পড়াশুনো তো শিখবে। ওদের কাছে সরকারি সাহায্য উল্লেখযোগ্যভাবে কিছু আসেনি, আর আসবেই বা কেন? ওরা স্বপ্ন দেখায় পিছিয়ে নেই। নিজেদের জমিতে চাষ আবাদের বাসনা সেই কতকাল থেকে, ওদের পোড়া কপালে চাষযোগ্য খাস জমি জোটেনি। এবার যে দলই ভোট চাইতে আসে সবার কাছে অনুরোধ করে ওদের স্থায়ী রোজগারের জন্য যেন কিছু ব্যবস্থা নেয়।

এছাড়া ময়নাগুড়ি রোড এলাকা আছেন নন্দ কুমার রায় ও তার সাকরেদরা যারা যে কোনও সাপ ধরতে সিদ্ধহস্ত। তারা 'ময়নাগুড়ি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালনা করেন। দূর দূরান্ত থেকে সাপ ধরতে তাদের কাছে ডাক আসে। মানুষের ডাকে তারা ছুটেও যায়। কিছু মানুষ তাদের সামান্য কিছু সম্মান দক্ষিণা দেয়। কদাচিৎ খাবারের ব্যবস্থাও করে। তবে তাদের কিছু চাহিদা নেই। তারাই বন দপ্তরকেও খবর দেয়। সাপ ধরা হয় চোখের দৃষ্টি,

সাহস আর ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে। সাপ ভয় না পেলে কামড়ায় না। ঘরে সাপ ঢুকলে গৃহস্থ ধোঁয়া দেয়, শুকনো লঙ্কা পোড়ায়। নাগাড়ে চলে খোঁচাখুচি, চিৎকার এতে সাপ হিংস্র হয়ে ওঠে। এমন সাপ ধরা সত্যি খুব কঠিন।

সেদিন অনেক কথা হয়েছিল বিশ্বজিৎবাবুর সঙ্গে। বলা যায় জেলার অন্যতম সর্প বিশারদ, যিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে থাকেন। সাপের কামড়ে প্রতি বছর সারা দেশে প্রায় ছেচল্লিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারান, যা কিনা সারা পৃথিবীর মোট সাপের কামড়ে মৃত্যুর অর্দ্ধেক। সেখানে সর্প সংরক্ষণে ওনার তৎপরতা আমাদের আশ্চর্য করে বৈকি। উনি বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কথা বললেন। ইদুঁর প্লেগ রোগের বাহক অন্যদিকে সাপের খাদ্য। অ্যান্টিভেনাম সাপের কামড়ের নির্ভরযোগ্য ওষুধ, সাপের বিষ থেকেই তা তৈরি হয়। এটা ছাড়াও সাপের বিষ থেকে উৎপন্ন ওষুধ, নানা মারণ ব্যাধি থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ক্যানসার চিকিৎসায় সাপের বিষ দিয়ে তৈরি ওষুধ অত্যন্ত কার্যকরী। গোখরো, কেউটে, সিন্ধু কালাচ, কৃষ্ণ কালাচ প্রভৃতি সাপের বাস জনবসতির আশপাশে। দাঁড়াশ, লাউডগা, হেলে, ঢোড়া প্রজাতির সাপও আমাদের পরিবেশেই ঘোরাফেরা করে। ডুয়ার্সের জঙ্গলে পাহাড়ে বিশাল বপু নিয়ে অলস চলনে ঘুরে বেড়ায় অজগর বা পাইথন।

বিশ্বজিৎ দত্ত চৌধুরী মহাশয় বহু সাপ উদ্ধার করেছেন, আহত সাপের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। উনি বলছিলেন মানুষকে সচেতন করাটাই আসল চ্যালেঞ্জ। একটু সাবধান হলে সাপে-মানুষে সংঘাত এড়ানো অসম্ভব নয়। সোনালি চতুর্ভূজ প্রকল্পে ফোর লেন তৈরির কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। জেসিবি মেসিনে গাছপালা, ঝোপঝাড় নিমেষের মধ্যে লয় পাচ্ছে, মারা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির সাপ। স্থানীয় মানুষরা জানেন কোথায় কোন সাপের আস্তানা, তাদের সাহায্য নিলে আর একটু সতর্ক হলেই ওদের বাঁচান সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে ধূপগুড়ির মিন্টুবাবুর কথা আলোচনায় উঠে এসেছিল যিনি এক প্রান্তিক এলাকায় বাস করেও সাপের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার কাজ করে গেছেন। আমরা জেনেছি বিশ্বজিৎবাবুকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন বন বান্ধব উৎসবে তাঁর কাজের স্বীকৃতি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। উনি বলছিলেন গত হুজুর সাহেবের মেলায় রায়গঞ্জ থেকে কিছু সাপুড়ে সম্প্রদায়ের মানুষ বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপের খেলা দেখাচ্ছিল। এটা বেআইনি জেনেও এমন কিছু করা মোটেই উচিত নয়।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম সারা উত্তরবঙ্গ জুড়েই সাপুড়েরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। সর্বক্ষেত্রেই তারা যে শুধুমাত্র বন সংলগ্ন অঞ্চলে বাস করত এমনটাও মোটেই ঠিক নয়। অবশ্যই নিম্নবর্ণের মানুষ ছিলেন তারা। যেহেতু প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ মেনেই তারা বন থেকে শিকড়বাকড় যোগাড় করত কাজেই তাদের ওষুধের উপর একসময় গ্রামের মানুষ ভরসা করত। হাঁপানি ও বাত সহ বহুপ্রকার যন্ত্রনার ওষুধ তারা সাপের বিষ থেকে বানাতে জানত। তারা নির্দিষ্ট কোনও এলাকায় দল বেঁধে বাস করে না তাই তাদের চট করে চেনা যায় না। যদিও আমগুড়িতে ওরা মোটামুটি এক সাথেই বাস করে, সেটাকে ব্যতিক্রম বলা যেতেই পারে। অন্যসব গরীব মানুষের মত কেউ দিন মজুর, কেউ রিক্সা চালক, কেউ হয়ত বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজের মূলস্রোতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

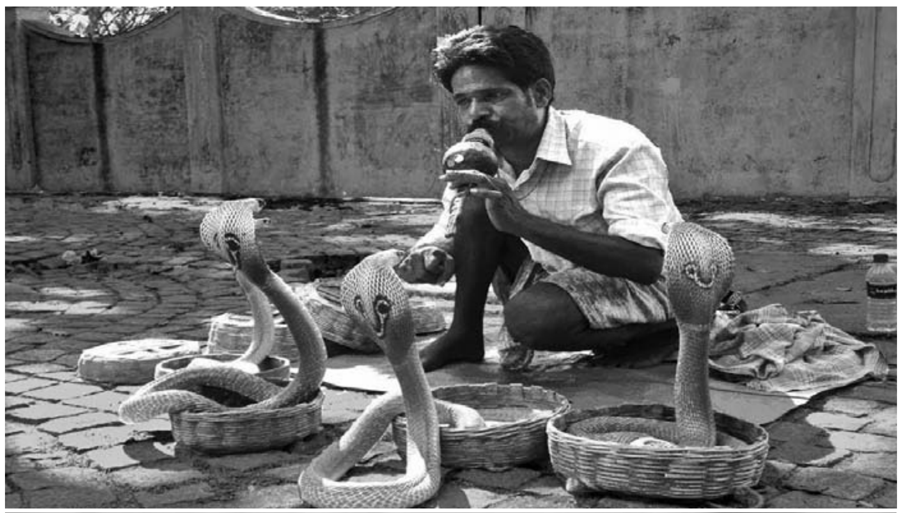

বিশ্বজিৎবাবুকে বলা যায় জেলার অন্যতম সর্প বিশারদ, যিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে থাকেন। সাপের কামড়ে প্রতি বছর সারা দেশে প্রায় ছেচল্লিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারান, যা কিনা সারা পৃথিবীর মোট সাপের কামড়ে মৃত্যুর অর্দ্ধেক। সেখানে সর্প সংরক্ষণে ওনার তৎপরতা আমাদের আশ্চর্য করে বৈকি। বিশ্বজিৎবাবুকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন বন বান্ধব উৎসবে তাঁর কাজের স্বীকৃতি দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।

লজ্জাবতী পাহাড়ি গাঁ পারখা

অতসী দে

পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে আমার শরীর কখনও ঠিকঠাক সঙ্গত করে না। চোখের সৌন্দর্য মন অবধি পৌঁছলেও শরীরে এসে ধাক্কা খায়। তবু আমাদের কাছে বেড়ানো বলতেই পাহাড়। নদী সমুদ্র জঙ্গলে অল্পদিনের জন্য বুড়িছোঁয়া করে নিলেও ঘুরতে যাচ্ছি বলতেই বোঝায় সেই লম্বা রাস্তার শেষে মাথা উঁচু করে দিগন্ত বিস্তৃত করে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু উঁচু পাহাড়। সেই পাহাড়ের সৌন্দর্যে, সেই পাহাড়ের আকাঁবাকা পথে আমি বিমোহিত হই। পথের পাশে ফুটে থাকা নাম না জানা ফুলে মনে

দোলা লাগে। আর পাহাড়িয়া নদী দেখে আমার অবচেতনের আনন্দ ফুলে ফেঁপে ওঠে। তাই এবারেও আমরা ছোটাছুটির ফাঁক গলে চলে গিয়েছিলাম সিকিম। সিকিমের রাস্তায় বাঁক অনেক। বাঁকের সংখ্যা যেমন রাস্তার সৌন্দর্য বাড়ায় তেমনি আমারও কষ্ট বাড়ায়। পারখা ও মাজৌলি এই ছিল এবারের গন্তব্য। কেকের উপরে টপিংয়ের মত বাড়তি পাওনা ছিল হোম স্টে। আর ছিল কমবেশি ট্রেকিংএর মজা।

পূর্ব সিকিমের পারখাতে যেখানে ছিলাম সেই হোম স্টে টা এমনিতেই প্রধান রাস্তা থেকে অনেক নিচুতে। ওখানে যে আদৌ কোনও থাকার জায়গা আছে তাও আবার এত সুন্দর ফুলে ফুলে ভরা, ভাবনার কোনও ধারে কাছেই তা জায়গা পায় না। তবু যখন অবাকভাবে তা দেখলাম, মুখের বলিরেখায় শুধু মুগ্ধতাই প্রকাশ পাচ্ছিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে আরও নেমে চলে এলাম জঙ্গলের মধ্যিখানে ছায়ামাখানো ঘরখানিতে। ঘরের

ডুয়ার্স প্যাকেজ টুর

২ রাত ৩ দিন: গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা। **৩ রাত ৪ দিন:** গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সুনতালেখোলা-জল্পেশ তিনবিঘা-কোচবিহার। **৪ রাত ৫ দিন:** গরুমারা-ঝালং-বিন্দু-সামসিং-সুনতালেখোলা জল্পেশ-তিনবিঘা-কোচবিহার- জলদাপাড়া-বক্সা। নিউ জলপাইগুড়ি/নিউ মাল থেকে, ইকনমি/ডিলাক্স প্যাকেজ

যোগাযোগ ৯৮৩০৪১০৮০৮/৯৯৩৮৩২১২৩

DHUPJHORA SOUTH PARK

Murti, Gorumara NP Jalpaiguri, West Bengal

Accommodation: Super Delux Room (DBR) 4 nos, Delux Ethnic Rooms (DBR) 4 nos, Standard Family Rooms (4-6 BR) 5 nos.

Common Dine-in place for breakfast- lunch- evening snacks-dinner, Conference Hall; Cycling, Angling, Adventure sports like Burma Bridge, Cylinder Walk, Bosun Chair, Commando Walk and Zip Line.

Marketing & Booking Contact:

Kolkata 9903832123, 9830410808 | Siliguri 9434442866, 9002772928

থেকে বারান্দাটাই যেন বেশি সুন্দর। হাত বাড়ালে জঙ্গলের পাতা ধরা যায়, হেঁটে গেলে গভীরে পৌঁছে যাওয়া যায়। প্রকৃতির এত কাছে একদম কোলের কাছে এইভাবে থাকতে পারা সম্ভব বলে কখনও ভাবতে পারি নি। তাই দুদিনের জন্য বারান্দাই হয়ে উঠল সব। রাত যত বাড়তে থাকে জঙ্গলের রহস্যের হাতছানিও তত বাড়তে থাকে। চারিদিক অন্ধকার করে বারান্দায় বসে দূর আকাশে প্রায় পূর্ণ শশী দর্শন মনের অবস্থান কে যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে হয়ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্য নিতে হবে তাই বর্ণনায় না গিয়ে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত রইলাম। ওই নয়নাভিরাম দৃশ্য মন ভরে দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে মধ্যরাতের জঙ্গলের অনবরত ঝিঁঝিঁর শব্দ ও নিকষ কাল রূপের মাঝে গাছপালার নড়াচড়া দেখতে দেখতে ঘোর এসে গিয়েছিল।

সকালে কয়েক ঘন্টায় জঙ্গলের মধ্যে বেড়ানোর লোভ দেখিয়ে 'কমলজী' যেভাবে শশুরে ৬ জন মানুষকে নিয়ে প্রায় ৬ ঘন্টায় পাহাড় টপকে টপকে ট্রেকিং করতে করতে আর এক পাহাড়ে, আবার আর এক পাহাড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন তা অবিশ্বাস্য। সবাই আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের ভাড়ার পূর্ণ করলাম ঠিকই কিন্তু শরীরের অবস্থা কাহিল। অবশ্য তার জন্য দিনের শেষে রাগ নয় একরাশ ভালবাসা দিয়েছিলাম তাঁকে। গ্রামের সরু পথ দিয়ে যাত্রা শুরু করে জঙ্গলের মধ্যের গাছগাছালির বাধা টপকে আরও উপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ করেই এসে পৌঁছলাম ছড়ানো একটা ক্ষেতে। তারপর আবার চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ঝর্ণা যেখানে গভীর অরণ্যের মাঝে নিজের বহমানতার প্রমাণ রেখে চলেছে সেখানে ভিজে পিচ্ছিল পাথরের উপর নিজেদের শরীরের ব্যালান্স ঠিক রাখতে রাখতে এগিয়ে চললাম। এই বুঝি ফসকাল পা, এই বুঝি ফসকাল হাতের টান। এলাচ গাছের মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা এসে পড়েছে এমন এক বাঁকে যেখান থেকে অনেক অনেক সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে পাহাড়ের মাথায়। ওখানে দাঁড়িয়ে নীচের শহরটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলাম।

আমাদের শহুরে শরীর কতটা ধকল সহ্য করতে পারে তার আন্দাজ 'কমলজী' নিশ্চয়ই করতে পেরেছিলেন। তাই সিকিমের 'প্যাশনফ্রুট'এর তিন বোতল জুস সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। সেই এনার্জিবর্ধক জুস যখন তলানিতে তখন বাধ্য হয়ে চায়ের খোঁজে গ্রামের ঘরে উঁকি দিতেই হল। তাঁরা পরম যত্নে বিস্কুট সহযোগে চা খাওয়ালেন। তাঁদের পোষ্য খরগোশ, কুকুর ও পাহাড়ি ভেড়াদের সাথেও আলাপ হল। কিছুটা সময় সেখানে কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে একই পথ ধরে ফিরে চললাম। এবার উৎরাই, যা চড়াইএর

সকালে কয়েক ঘন্টায় জঙ্গলের মধ্যে বেড়ানোর লোভ দেখিয়ে 'কমলজী' যেভাবে শশুরে ৬ জন মানুষকে নিয়ে প্রায় ৬ ঘন্টায় পাহাড় টপকে টপকে ট্রেকিং করতে করতে আর এক পাহাড়ে, আবার আর এক পাহাড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন তা অবিশ্বাস্য। সবাই আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের ভাড়ার পূর্ণ করলাম ঠিকই কিন্তু শরীরের অবস্থা কাহিল। অবশ্য তার জন্য দিনের শেষে রাগ নয় একরাশ ভালবাসা দিয়েছিলাম তাঁকে। গ্রামের সরু পথ দিয়ে যাত্রা শুরু করে জঙ্গলের মধ্যের গাছগাছালির বাধা টপকে আরও উপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ করেই এসে পৌঁছলাম ছড়ানো একটা ক্ষেতে।

চেয়ে ঢের কষ্টের ও সাবধানের। 'কমলজী' যেমনভাবে পাশে থেকে হাত ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন তেমনিভাবেই বরং আরও সযত্নে নামিয়ে আনলেন। কয়েক ঘন্টার হাঁটা পথের সেই সুন্দর সময় হোম স্টে-র মালিক ও সেখানকার সম্মানীয় মানুষ 'কমল গুরুংজী' অনায়াস দক্ষতায় বন্ধুর মত সঙ্গ দিয়ে আমাদের একটা সুন্দর ও রোমাঞ্চকর সকাল ও দুপুর উপহার দিলেন। ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে আবার সেই বারান্দা। আনন্দ শুষে নিতে সেখানে হত্যে দেওয়া।

তবে সে রাতের বাড়তি আকর্ষন ছিল 'বনফায়ার'। পরিবারের সকলে আমাদের আনন্দের অংশীদার হল। হাত বাড়ালেই বন্ধুর মত, হাত বাড়ালেই জঙ্গল আর তার ভিতরে অপার রহস্য। এমন মন কেমন করা জায়গা থেকে আমাদের কাল চলে যেতে হবে হয়ত কখনও আর আসবই না। এমনই এক মন খারাপ নিয়ে সে রাতে বিছানায় গেলাম। মনে পড়ল আরম্ভের সেই দুপুরকে। শেষের রাত্রি কানে কানে বলল, একদিন সবশেষ হবে হে আরম্ভ বৃথা তব অহংকার তবে। তবু চির সত্যিটা জেনেও চিরকাল আরম্ভের সেই অহংকার আমরা মাথা পেতে নিয়েছি আবার শেষের ব্যথাও সহ্য করেছি।

সকাল হয়ে বেলা বাড়তেই নতুন পথ, নতুন রাস্তা, নতুন গন্তব্য।

ছবি মৃন্ময় দে

পারখা

পূর্ব সিকিমের পাকিয়ং থেকে ১৩ কিমি দূরের গ্রাম পারখা। আকাশপথে এলে পাকিয়ং বিমানবন্দর থেকে ১০ কিমি। গ্যাংটক থেকে ৪৫ কিমি। চমৎকার হোম স্টে ব্যবস্থা। দেখার কী আছে প্রশ্ন করে বসবেন না আবার! সবটাই দেখবার এবং ভাল লাগবার। হোমস্টে বুকিং বা অন্যান্য তথ্যের জন্য ফোন করতে পারেন ৮২৪০৭৭০৮০৫।

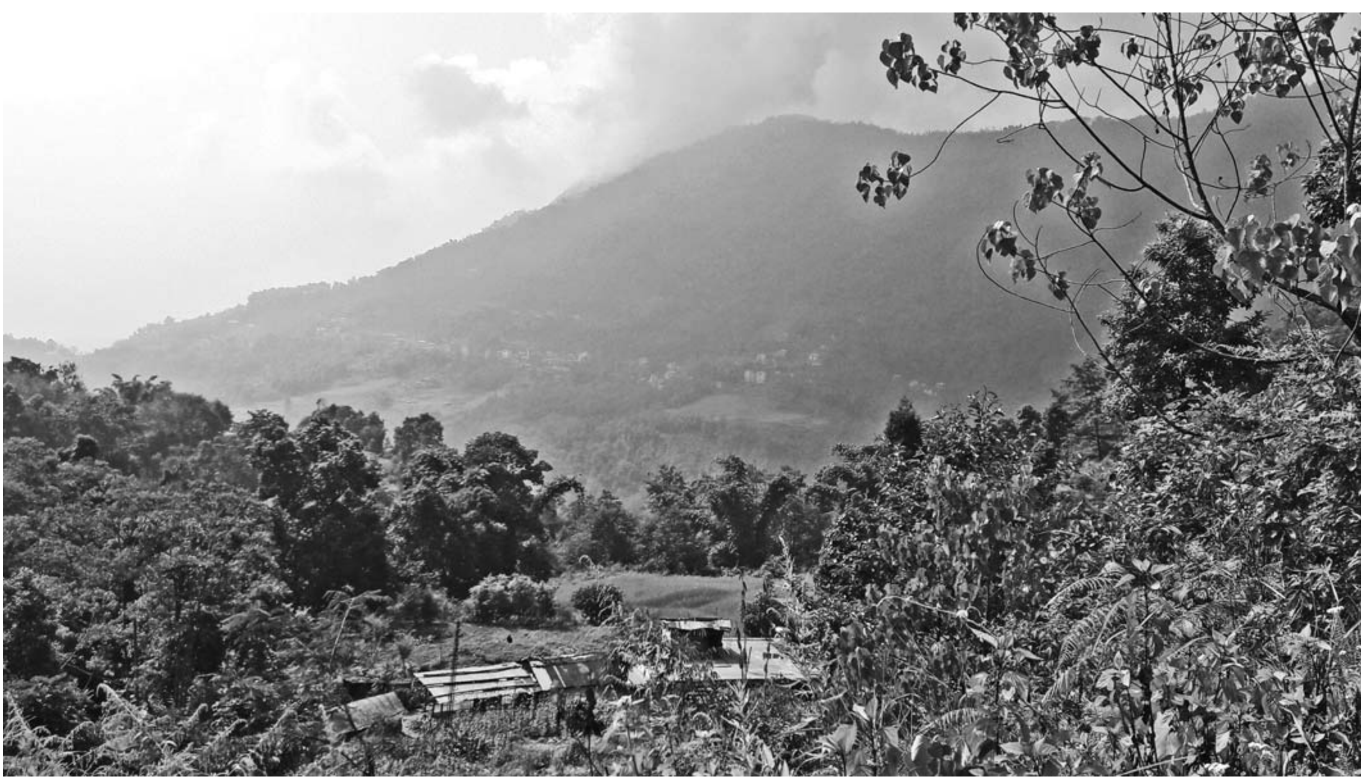

রাজনীতিতে ভাষা সন্ত্রাসের শিকার সেই নারীই !

রাখি পুরকায়স্থ

ভোটের বাজার গরম হতেই নারী রাজনীতিকদের ওপর যৌনবাদী ভাষা সন্ত্রাসের নির্লজ্জ ঢেউ প্রবল বেগে আছড়ে পড়ছে। কোনও শুভ চেতনা সম্পন্ন মানুষের পক্ষেই তা উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। দল-মত নির্বিশেষে সারা ভারতের নারী রাজনীতিকদের শারীরিক গঠন, গায়ের রঙ, পোশাক, ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র কটূক্তির ঝড় বয়ে চলেছে। অথচ পুরুষ রাজনীতিকদের নিয়ে এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হতে আমরা কদাচিৎ দেখি। দুর্ভাগ্যের কথা, নারী রাজনীতিকদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেওয়া এমন সব যৌনবাদী মন্তব্যের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রতিবাদের আওয়াজ বড়ই ক্ষীণ !

তবে ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, এমন যৌনবাদী ভাষা সংন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনা মোটেই নতুন নয়। আগেও বহুবার ভারতীয় রাজনীতিকেরা নারী রাজনীতিকদের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বহুজন সমাজ পার্টির সর্বোচ্চ নেত্রী মায়াবতী ক্রমাগত যৌনবাদী শাব্দিকআক্রমণের শিকার হয়ে চলেছেন। বিরোধী দলের রাজনীতিকেরা, এমনকি মহিলা রাজনীতিকেরা অবধি, বারবার তাঁকে ‘কুৎসিত’ কিংবা ‘হিজড়া’ বলে উল্লেখ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরের এক জনসভায় সমাজবাদী পার্টির ওম প্রকাশ সিংহ বলেছিলেন, ‘আপ লোগ তো বহুৎ বাহাদুর হো। জব আপ লোগ মায়াবতী যেইসি সুরৎ কী ঔরৎকো পাঞ্চ সাল তক ঝেল সাকতে হো, তো থোরা সময় তো হাম লোগো কো ভি দে সাকতে হো’ (আপনারা তো খুব সাহসী। মায়াবতীর মত চেহারার মহিলাকে যখন পাঁচ বছর ধরে সহ্য করতে পারছেন, আমাদেরও নিশ্চয়ই কিছু সময় দিতে পারবেন)। মায়াবতী সম্পর্কে বিজেপি দলের সদস্য ও উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক সাধনা সিংহ বলেছিলেন, ‘উয়ো তো কিন্নর সে ভি জ্যাদা বদতর হ্যায়, কিউঁকি উয়ো তো না নর হ্যায়, না মহিলা হ্যায়’ (ও তো হিজড়ার চেয়েও বেশি খারাপ, কারণ সে না পুরুষ, না নারী)।

একবার বিজেপির মুখপাত্র শাইনা এনসি বিদ্রুপ করে বলেছিলেন, বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী ‘পুরুষ’ না ‘নারী’, তা নাকি তিনি জানেন না। চিরকাল ব্যাপী ‘স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ’ করে আসা পশ্চাদমুখী ধ্যানধারণার ওপর ভিত্তি করে তিনি মায়াবতীর লিঙ্গ পরিচয়কে আক্রমণ করেছিলেন। শাড়ি কিংবা ‘মেয়েলি রং’-এর সালোয়ার কামিজ পরিধান না করা এবং ‘পুরুষালি ঢঙে’ ছোট-ছোট করে কাটা চুলের কারণে মায়াবতীর দিকে বিভিন্ন সময়ে নানান কদর্য মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে বারবার তাঁর চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে !

একজন নারীকে যৌনকর্মীর সাথে তুলনা করা একটি রূপক, আসলে তা দ্বারা যৌনবাদীরা তাঁদের পৌরুষত্ব প্রদর্শন করে থাকেন। এর ফলে আলোচ্য নারীটিরই কেবলমাত্র মর্যাদাহানি হয় না, যৌনকর্মীদেরও মানুষ হিসেবে অমর্যাদা করা হয়। পুরুষতন্ত্র মনে করে, যৌনকর্মীরা সমাজের নিকৃষ্টতম জীব। সেক্ষেত্রে দয়াশঙ্কর সিংহের মত নেতাদের পক্ষে বোঝা কঠিন, যৌনকর্মীদেরও রয়েছে সসম্মানে মানুষের মত বাঁচবার অধিকার !

আরেকবার বিজেপি নেতা দয়াশঙ্কর সিংহ বলেছিলেন, ‘মায়াবতী একজন বেশ্যার চেয়েও খারাপ, কারণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ প্রদানকারী ব্যক্তিকেই তিনি নির্বাচনী আসন প্রদান করেন’। একজন নারীকে যৌনকর্মীর সাথে তুলনা করা একটি রূপক, আসলে তা দ্বারা যৌনবাদীরা তাঁদের পৌরুষত্ব প্রদর্শন করে থাকেন। এর ফলে আলোচ্য নারীটিরই কেবলমাত্র মর্যাদাহানি হয় না, যৌনকর্মীদেরও মানুষ হিসেবে অমর্যাদা করা হয়। পুরুষতন্ত্র মনে করে, যৌনকর্মীরা সমাজের নিকৃষ্টতম জীব। সেক্ষেত্রে দয়াশঙ্কর সিংহের মত নেতাদের পক্ষে বোঝা কঠিন, যৌনকর্মীদেরও রয়েছে সসম্মানে মানুষের মত বাঁচবার অধিকার ! তাঁর মত নেতাদের মুখ থেকে নির্গত এই ধরনের নারী-বিদ্বেষী মন্তব্য প্রকৃতপক্ষে তাঁদের পুরুষতান্ত্রিক অহংকে পুষ্ট করে, কারণ মায়াবতীর মত একজন মহিলাকে কোনও রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হিসেবে সহজে মেনে নিতে পারাটা তাঁদের পক্ষে খুবই কঠিন।

আরেক নারী রাজনীতিক যিনি বারবার কুরুচিকর মন্তব্যের শিকার হয়েছেন, তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। নোটবন্দীর প্রতিবাদ করায় পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ মমতাকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, বিক্ষোভস্থলে উপস্থিত ‘তাদের পুলিশ বাহিনী’ চাইলেই মমতার চুল ধরে টেনে আনতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা সেটা না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অতীতে মমতাকে কালীঘাটের ময়না (কথা বলা পাখি) বলে সম্বোধন করেছিলেন সিপিআই(এম) পার্টির সদস্য ও সাত বারের সাংসদ অনিল বসু। এছাড়া ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিপুল অর্থ ব্যয়ের পেছনে মমতার কোনও ধনী খদ্দের আছেন, এমন সন্দেহ প্রকাশ করে সোনাগাছির

মায়াবতী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়াপ্রদা, জয়া বচ্চন এরা সকলেই রাজনীতিতে ভাষা সন্ত্রাসের শিকার

যৌনকর্মীদের সাথেও তাঁর তুলনা করেছিলেন অনিল বসু। বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে, রাজনীতিক হিসেবে মমতার দক্ষতা এবং নৈতিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশার্থে তাঁর অবিবাহিত থাকাকে নিশানা করা হয়েছে।

বিজেপির গিরিরাজ সিংহ তদানীন্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর রাজনৈতিক দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাঁর ত্বকের রঙকেই তাঁর রাজনৈতিক সাফল্যের একমাত্র কারণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'রাজীব গান্ধী যদি কোনও নাইজেরিয়ান মহিলাকে বিয়ে করতেন, তাহলে কংগ্রেস পার্টি সম্ভবত সনিয়াকে সভানেত্রী হিসাবে মেনে নিতে পারত না'। এই মন্তব্য ঘিরে তুমুল নিন্দার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। শেষমেশ লোকসভায় সোনিয়া গান্ধীর কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়েছিল তাঁকে।

রাজনীতির অঙ্গনে নতুন প্রবেশক কংগ্রেসের প্রিয়াংকা গান্ধীও অনুরূপ অকথ্য ভাষা ও যৌনবাদী মন্তব্যের শিকার হয়েছেন। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে 'স্কার্ট ওয়ালি বাঈ' (স্কার্ট পরা মহিলা) বলে অভিহিত করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন বিজেপি নেতা জয়করণ গুপ্তা। বিজেপির উত্তরপ্রদেশ শাখার জয়করণ গুপ্তা বলেছেন, '... স্কার্টওয়ালি বাঈ শাড়ি পরে মন্দিরে যেতে শুরু করেছেন, যারা এতদিন গঙ্গাজলকে ঘৃণা করত, তারাও এখন গঙ্গা দর্শনে যাচ্ছেন'। বিজেপি নেতা বিনয় কাটিয়ার বলেছিলেন, 'প্রিয়াংকা গান্ধীকে যতটা সুন্দরী বলে প্রচার করা হয়, তিনি মোটেই ততটা সুন্দরী নন। তাঁর তুলনায় অনেক সুন্দরী নারীরা বিজেপিতে আছেন, যেমন স্মৃতি ইরানি, যাঁরা ভিড় টানতে পারে এবং অনেক ভাল বক্তৃতা দিতে পারে।'

পুরুষ রাজনীতিকদের অতীত জীবন নিয়ে খুব কমই আলোচনা হতে দেখা যায়, অথচ অভিনেত্রী থেকে রাজনীতিকে পরিণত মহিলাদের রাজনীতি সম্পর্কিত'গুরুতর' বিষয়গুলি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অক্ষমতা আছে ধরে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডে আসামে হিংসার বিষয়ে রাজ্যসভার আলোচনার সময় অভিনেত্রী জয়া বচ্চনকে দোষারোপ করে বলেছিলেন, 'এটি একটি গুরুতর বিষয়, কোনও চিত্রনাট্য নয়'। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আরেকটি নাম, বিজেপির স্মৃতি ইরানি, যিনি অতীতে একজন জনপ্রিয় টিভি ধারাবাহিক তারকা ছিলেন। মন্ত্রিসভার রদবদলের পর, স্মৃতি ইরানি মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে বস্ত্র মন্ত্রকে স্থানান্তরিত হওয়াতে জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর সাংসদ আনোয়ার আলী তাঁকে নিয়ে একটি অসম্মানজনক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'ভাল হয়েছে, স্মৃতি ইরানি বস্ত্র মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন, এটা এবার তার শরীর ঢাকায় সাহায্য করবে'। স্মৃতি ইরানি যেহেতু একজন টেলিভিশন তারকা এবং মডেল ছিলেন, তাই জেডিইউ নেতা সম্ভবত ভেবেই নিয়েছিলেন যে স্মৃতির জামাকাপড় নিয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করলে একজন মহিলা রাজনীতিককে বেশ করে অপমান করা হবে। বিভিন্ন সময় স্মৃতির ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে। সম্প্রতি কংগ্রেসের সহযোগী জয়দ্বীপ কাওয়াড়ে স্মৃতি ইরানিকে নিয়ে অমার্জিত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'স্মৃতি ইরানি তাঁর কপালে একটি বড় টিপ পরেন। স্বামী পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে তাঁর সেই টিপের আকারও ক্রমাগত বড় হচ্ছে'। তিনি আরও বলেন, 'মোদীজীর মন্ত্রীসভার সদস্য স্মৃতিজী সংসদে বসে সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলেন, কিন্তু তার মনে রাখতে হবে সংবিধান পরিবর্তন করা স্বামী পরিবর্তনের মত সহজ কাজ নয়'!

এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস দুজন নতুন নায়িকাকে মনোনয়ন দিয়েছে। যাদবপুর কেন্দ্রে মিমি চক্রবর্তী ও বসিরহাট কেন্দ্রে নুসরত জাহান। তাঁদের প্রার্থীপদ নিয়ে বিরোধী দলগুলির ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ প্রায়ই শালীনতার সীমা ছাড়াচ্ছে। দুই অভিনেত্রীর পুরনো ফটো শুটের ছবি খুঁজে বের করা হচ্ছে, যেখানে তাঁরা খাটো পোশাক পরে আছেন, বা দর্শকের দিকে চুমু ছুঁড়ে দেওয়ার ভঙ্গী করছেন। তাঁদের পুরনো সিনেমার দৃশ্য খুঁজে বের করা হচ্ছে, যেখানে হয়ত তাঁদের সংলাপ ছিল অশ্লীল। এমনকি অন্য কারও নগ্ন ছবিতে এঁদের দুজনের মাথা কেটে বসিয়ে দিয়ে, অর্থাৎ 'মর্ফ' করা ছবিও, ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। এই বিতর্কের পেছনে আছে সমাজের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গী, যে যাঁরা অভিনয় করেন, মেধা বা বুদ্ধির সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না এবং স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক সচেতনতাও তাঁদের থাকবে না। তাছাড়া সিনেমায় মেয়েদের যতটা না স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে দেখানো হয়, তার থেকে অনেক বেশি বিনোদনের উপাদান করে তোলা হয়। যে কারণে সিনেমার অভিনেত্রীরা রাজনীতিতে এসেছেন শুনলেই লাগাম ছাড়া যৌন রসিকতার বন্যা বয়ে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার, চোর, জালিয়াৎ, কিংবা মিথ্যেবাদীদের সঙ্গে আমরা রাজনীতিকে যুক্ত করতে পেরেছি এবং মেনেও নিতে শিখেছি। কিন্তু রাজনীতির রণাঙ্গনে মহিলাদের প্রবেশ এখনও মেনে নেওয়া যায়নি। সেটা আমাদের মানসিক রক্ষণশীলতা।

নারী রাজনীতিকদের প্রতি আমাদের রাজনৈতিক দলের সদস্যদের, বিশেষ করে পুরুষ রাজনীতিকদের, যৌনবাদী মনোভাবকে তুলে ধরার জন্য কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হল। এমনটা নয় যে রাজনৈতিক ক্ষেত্র কেবলমাত্র সভ্য আচরণের জন্যই বিখ্যাত, কিন্তু কখনও কখনও কিছু রাজনীতিক ভদ্রতা-সভ্যতার মাপকাঠিতে আরও নিচে নেমে আসেন! শুধুমাত্র মহিলা রাজনীতিকদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু অভদ্র ভাষার ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে সেই সব মানুষদের মানসিকতার গভীর পচনকে প্রতিফলিত করে, যারা নারীকে লড়াই করে রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হতে দেখতে চান না। প্রকৃতপক্ষে মনের অন্তঃস্থলে এই নারী-বিদ্বেষী রাজনীতিকরা সংকটাপন্ন বোধ করেন, কারণ এই মহিলারা ভবিষ্যতে তাঁদের অস্তিত্ব সংকটের প্রধান কারণ হয়ে উঠতে পারেন। এই মহিলারা সকলেই শক্তিশালী রাজনীতিক কিন্তু এখনও তাঁরা নারী বিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার! এটাই আমাদের সমাজে সাধারণ মহিলাদের প্রকৃত অবস্থান কী, তা স্পষ্ট করে।

নির্বাচনে জিতে এই রাজনীতিকরাই আমাদের আইন প্রণেতা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী হন। সর্বোপরি সংসদে তাঁরাই আম জনতার প্রতিনিধি। কিন্তু যখন দেখা যায়, নারী রাজনৈতিক সহকর্মীদের সম্বোধন করার সময় তাঁদের শালীনতা বোধের অভাব রয়েছে, তখন আমরা কীভাবে তাদের বৃহত্তর নারী জনসংখ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আশা রাখতে পারি? কেন রাজনৈতিক দলগুলি এই কুরুচিসম্পন্ন রাজনীতিকদের রক্ষা করে? কেন মহিলা রাজনীতিকরা একে অপরের বিরুদ্ধে যৌনবাদী ভাষা সন্ত্রাস শুনেও চুপ করে থাকেন? কেন তাঁরা এমন নারী বিদ্বেষী আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না? রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা দলের প্রতি আনুগত্য কি নারীদের মর্যাদার উর্ধ্বে?

এই প্রশ্নগুলি আমাদের জিজ্ঞেস করা খুব দরকার, কারণ আমরা মতদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল সংখ্যক নারীদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্ব সেই সব রাজনীতিকদের হাতেই বারবার সঁপে দেই, যারা সুযোগ পেলেই নারীদের প্রতি তাদের অসুস্থ মানসিকতা প্রদর্শনে নেমে পড়েন। দুঃখের বিষয়, খুব কম রাজনৈতিক দলই এদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয় এবং এভাবেই এই সব রাজনীতিকদের যৌনবাদী মন্তব্যগুলি পুনরাবৃত্তি করার পথ আরও মসৃণ হয়ে ওঠে।

এসব দেখে-শুনে মনে প্রশ্ন ওঠে, লিঙ্গ পরিচয়ের উর্ধ্বে গিয়ে নারী রাজনীতিকদের কি আদৌ কখনও পূর্ণ রাজনীতিকের মর্যাদা দেওয়া হবে? কেবলমাত্র বহিরঙ্গের দ্বারা তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারণ করার প্রবণতা বন্ধ হবে কবে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের আজও জানা নেই।

দেবযানী

এক পরাজিত প্রেমিকা ও স্ত্রী

শাঁওলি দে

মহাভারতের 'আদিপর্বে' আমরা দেবযানীর কথা জানতে পারি। যদিও এই আখ্যানে বৃহস্পতি পুত্র কচের সঙ্গে তার প্রেম পর্বই বেশি আলোচিত ও জনপ্রিয়, তবু দেবযানীর সম্পূর্ণ যাপন পর্যালোচনা করলে আমরা দিনের শেষে এক পরাজিত নারীকে দেখতে পাই, যে নারী না পেল তাঁর প্রেমিকাকে, না পেল তাঁর স্বামীর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

দেবযানী ছিলেন অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের প্রিয় কন্যা। দেব ও অসুরের যুদ্ধে মৃত অসুর সৈন্যদের সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতেন শুক্রাচার্য। কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতির এই মন্ত্র জানা ছিল না। দেবতারা তখন বৃহস্পতি পুত্র কচের শরণাপন্ন হলেন। কচকে জানান হল সে যদি শুক্রাচার্যের প্রিয় কন্যা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করতে পারে তবেই গুরু শুক্রাচার্যের থেকে কচ লাভ করতে পারবে এই সঞ্জীবনী মন্ত্র।

কচ সেইমত গুরুর কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে শুক্রাচার্যের কাছে সহস্র বছর থাকার ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করার অনুমতি চাইলেন। শুক্র রাজি হলেন। এরপর শুরু হল কচের গুরুগৃহে বসবাস করে গুরু ও গুরুকন্যাকে সেবা করা। নাচ, গান করে নানাবিধ উপহার দিয়ে কচ দেবযানীকে তুষ্ট করতে চাইলেন। দেবযানী সুন্দরী এবং সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা। সুপুরুষ কচকে এত কাছ থেকে পেয়ে মন দিয়ে ফেললেন তিনি, একসঙ্গে গান গাইতেন এবং কচেরও দেখভাল করতেন।

ইতিমধ্যে দানবেরা সব টের পেয়ে গেলে বারবার নানা উপায়ে তারা কচকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু দেবযানী তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা করে সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে বারবারই কচকে বাঁচিয়ে তুললেন। অবশেষে দানবেরা কচকে পুড়িয়ে তাঁর ছাই ভস্ম সুরার সঙ্গে মিশিয়ে স্বয়ং শুক্রাচার্যকেই খাইয়ে দিলেন। কচের দেখা না পেয়ে হাহাকার করে উঠলেন দেবযানী, পিতাকে জানালেন যদি কচ ফিরে না আসে, দেবযানীও অনুসরণ করবে ওই একই পথ। নিরুপায় হয়ে শুক্রাচার্য ডাক দিলেন শিষ্যকে। গুরুর জঠর থেকে উত্তর দিল কচ, নিজেকে গুরুর পুত্র হিসেবে গণ্য করতে বললেন। জানালেন অসুরেরা সুরার সঙ্গে পান করিয়ে দিয়েছে গুরুকে শিষ্যর অস্থি।

গুরু এবার দ্বিধাগ্রস্থ হলেন। সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করলে কচ বেঁচে উঠবে, কিন্তু মারা যাবেন তিনি নিজে। কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিসে সুখী হবে বল?' দেবযানী বিলাপ করে বললেন কাউকে ছাড়াই বাঁচবে না সে। শুক্রাচার্য তখন কচকে জানালেন, তিনি শেখাবেন সঞ্জীবনী মন্ত্র কচকে। মন্ত্রের বলে ফিরে আসার পর কচ যেন সেই মন্ত্র প্রয়োগ করে ফিরিয়ে আনেন স্বয়ং গুরুকে। কচ এভাবে বেঁচে ফিরলেন এবং সহস্র বছর গুরুগৃহে কাটানোর পর ফেরার অনুমতি চাইলেন স্বর্গলোকে।

এমন সময় পথ আটকালেন দেবযানী, তিনি মন দিয়ে ফেলেছেন কচকে। বিবাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন তিনি। কিন্তু গুরুপুত্রীর এই প্রস্তাবে কীভাবে সম্মতি জানাবেন কচ? গুরুর জঠরের ভেতর থেকে আবার তাঁর নতুন জন্ম হয়েছে, ধর্ম অনুসারে দেবযানী তাঁর ভগ্নী। দেবযানীর অনুরোধ যখন কিছুতেই মানলেন না কচ, দেবযানী অভিশাপ দিলেন, কিছুতেই ফলপ্রসূ হবে না কচের উচ্চারিত সঞ্জীবনী মন্ত্র। কচও দেবযানীকে ছাড়লেন না, অভিশাপ দিলেন কোনও ঋষিপুত্রের সঙ্গে বিবাহ হবে না কোনওদিন দেবযানীর। কচের বিদ্যার নিষ্ফল হবে না, কারণ কচ অন্য কাউকে শেখাবেন তাঁর মন্ত্র। এই বলে কচ ইন্দ্রলোকে চলে গেলেন।

প্রেমিকা হিসেবে হেরে গেলেন দেবযানী, সব থাকা স্বত্ত্বেও কিছুই পেলেন না তিনি অভিশাপ ছাড়া।

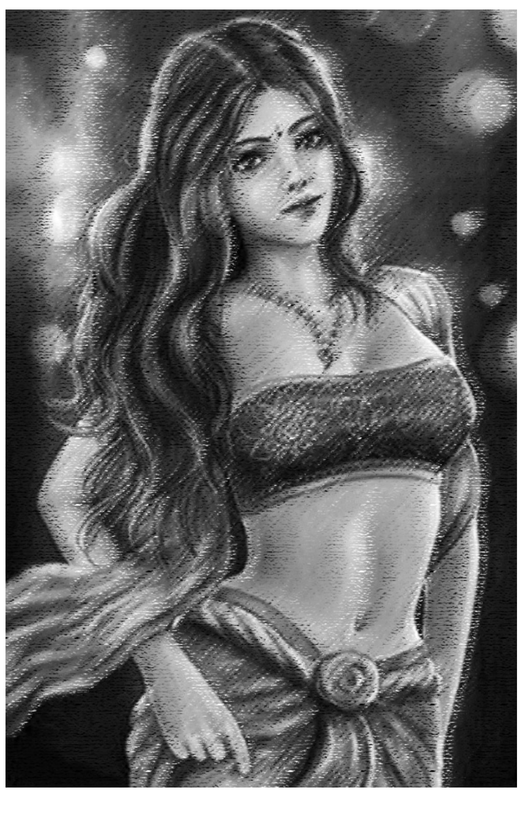

এর অনেক বছর পর, রাজা যযাতি মৃগয়া করতে এসে সালাংকারা দেবযানীকে দেখলেন। লক্ষ্য করলেন ওর পায়ের কাছে বসে আছে আরেক সুন্দরী অসুরপতি বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা। প্রসঙ্গত জানাই, কটু কথা বলার অপরাধে শর্মিষ্ঠা আরও সহস্র কন্যার সঙ্গে অধীন হয়েছিল দেবযানীর। দেবযানী যযাতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইলেন। বহুপূর্বে কূপ থেকে উদ্ধার করে যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন, তাই দেবযানী নিজেই পিতা শুক্রাচার্যকে ডেকেযযাতিকে বিবাহের অনুমতি চাইলেন।

যযাতির দ্বিধা ছিল, কিন্তু কচের অভিশাপে স্ববর্ণেও বিবাহ হবে না দেবযানীর। তাই আর কোনও বাধা রইল না। শুধু শুক্রাচার্য জানালেন শর্মিষ্ঠাও সঙ্গে যাবে, কিন্তু যযাতি কখনওই ওকে শয্যাসঙ্গিনী করতে পারবে না।

ইতিমধ্যে দেবযানীর পুত্র হল একটি। শর্মিষ্ঠা আরও হতাশগ্রস্থ হলেন। একদিন যযাতি অশোক বনে বেড়াতে এলে শর্মিষ্ঠা তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শুক্রাচার্যের নিষেধে যযাতি প্রথমে রাজি না হলেও শর্মিষ্ঠা নানা কথায় ভুলিয়ে যযাতিকে পাণিগ্রহণে বাধ্য করেন।

এরপর শর্মিষ্ঠারও দুই পুত্র হয়। কিন্তু শর্মিষ্ঠা দেবযানীর কাছে তাঁর স্বামীর নাম, গোত্র কিছুই জানায় না। দেবযানীর দুই পুত্র যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার তিন পুত্র দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। দেবযানী একদিন শর্মিষ্ঠার পুত্রদের থেকে জানতে পারে যে, ওই পুত্রদের পিতা স্বয়ং যযাতি এবং মাতা শর্মিষ্ঠা। ক্রোধে ঘর ছাড়লেন দেবযানী, শুক্রাচার্যের কাছে আশ্রয় নিলেন। শুক্রাচার্যও সব শুনে যযাতিকে জরাগ্রস্থ হওয়ার অভিশাপ দিলেন।

যযাতি অনেক অনুনয় করলেন শুক্রাচার্যের কাছে। কিন্তু একবার অভিশাপ দিলে আর ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই, তাই যযাতি করজোরে অনুমতি চাইলেন শুক্রাচার্যের কাছে, যদি পাঁচ পুত্রের মধ্যে কোনও এক পুত্র তাঁর যৌবন দেয়, বদলে যযাতি সেই পুত্রকে রাজ্য দেবেন, তিনি সুবিখ্যাত হবেন। শুক্রাচার্য রাজি হলেন। এর পরের কাহিনি যযাতি ও শর্মিষ্ঠা পুত্র পুরু ও তাঁর কীর্তির।

দেবযানী এইভাবে তাঁর স্বামীর সহচর্য হারালেন। সব পেয়েও রইলেন সর্বহারা। গুরু শুক্রাচার্যের প্রিয়তমা কন্যা, সুন্দরী দেবযানী না পেলেন তাঁর প্রেমিকাকে, না পেলেন তাঁর স্বামীকে। পুত্রেরা স্বামীর অভিশাপে হলেন রাজ্যহারা, নামহারা। রাজা যযাতির রাজ্য পেলেন শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু। দিনের শেষে হাতের মুঠোতে থাকল শুধু শূন্যতা আর শূন্যতা। এই কি প্রাপ্য ছিল দেবযানীর?

বড় গল্প

প্যাঁচা

রম্যাণী গোস্বামী

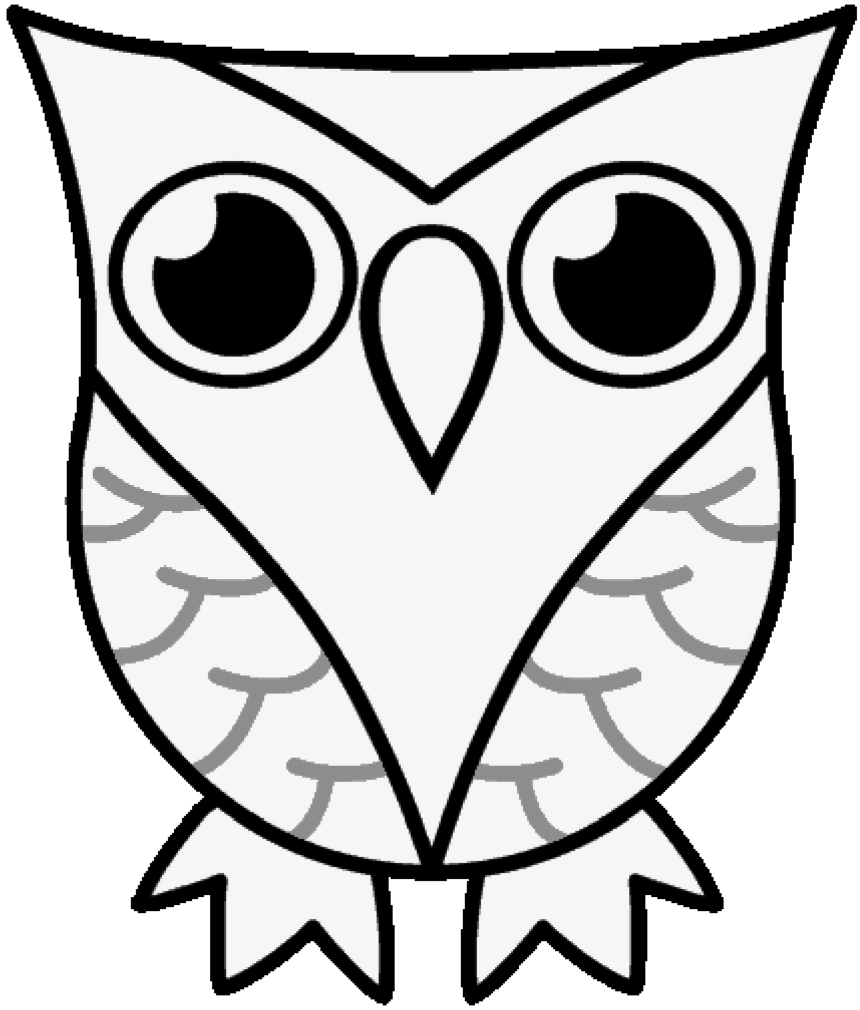

কারসিয়াং থেকে দার্জিলিং এর দিকে যাওয়ার পথে একটা পাহাড়ি অঞ্চল রয়েছে। নাম সোনাদা। সেখানে একটা ছোট্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আমি চাকরি পেয়েছি মাস চারেক আগে। স্কুল কমপাউন্ড ঘেঁষে যে কাঠের বাড়ি, তার একতলাটা ভাড়া নিয়েছি। নিমা ডোমা লামা বাড়ির মালকিন। উনি থাকেন দোতলায় তাঁর দুই যমজ সন্তানের সঙ্গে। একটি ছেলে। একটি মেয়ে। মিসেস লামা'র স্বামী হৃদরোগে মারা গিয়েছেন গতবছর। স্থানীয় একটি স্টেশনারি দোকানের কর্মচারী ছিলেন তিনি। তারপর থেকে মূলত বাড়িভাড়ার টাকায় আর রঙবেরঙের পাঁপড় বানিয়ে সেগুলি বিক্রি করে সংসার চলছে তার। আমাকেও চেখে দেখতে দিয়েছিলেন কয়েকটা লাল-হলুদ-সবুজ রঙা পাঁপড়। হয়ত আশা করেছিলেন কিনব। স্বাদটা আমার ভাল লাগেনি তেমন। কেনার ইচ্ছেও জাগেনি। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে সেই কারণে ভদ্রমহিলার আন্তরিকতায় কোনও খাদ জমা হয়নি। একা একা অচেনা জায়গায় পেটের দায়ে পড়ে আছি। নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাই। উনি একেবারে আপন ভাইয়ের মত ডাক খোঁজ করেছেন আমার অনেকবার।

একতলায় আমার ঘরের সামনে রয়েছে ছোট্ট একটা বারান্দা। বারান্দার নীচে তিনটে সিঁড়ি নেমে গেছে। তারপর নুড়ি বিছানো রাস্তাটা সোজা হারিয়ে গেছে পাইন বন ছাড়িয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে। বারান্দায় দাঁড়ালে দু' চোখ ভরে দেখা যায় নীল পাহাড়ের সারি। ধূসর নীল, গাঢ় নীল, কালচে নীল, নীলের যে এত বৈচিত্র হতে পারে সেটা এই পাহাড়ের দেশে না এলে জানাই হত না আমার। প্রকৃতি স্তরে স্তরে তার অভিনব সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে রেখেছে এখানে। স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে বিকেল। তারপর থেকে এই বারান্দাই আমার জগত। বাড়ি থেকে একেবারে যে বেরোই না তা নয়। লোকাল মার্কেটে যাই সওদা করতে ভোরে উঠে। স্থানীয় লোকজন তেমন কারও সঙ্গে আলাপ হয় নি। আমি নিশ্চিত যে আমার মত আর যে কোনও আশৈশব বাঘাযতীন এরিয়ার খুঁটে খাওয়া পাবলিক এমন সুনসান জায়গায় এসে এই চার মাসেই 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' বলে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ান হত। তবুও আমার দিব্যি লাগছে। তার পিছনে দুটো কারণ আছে। প্রথমত, কোনওদিনই খুব একটা মিশুকে নই আমি। ছেলেবেলা থেকে একগাদা বন্ধু বান্ধবও ছিল না। মা আর দিদির সঙ্গেই কেটেছে এতগুলো বছর। এখনও পর্যন্ত স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অভির সঙ্গেই সম্পর্ক টিকে আছে আমার।

তবে দ্বিতীয় কারণটাই আসল। হিস্ট্রিতে এমএ, বিএড করেও এসএসসিতে পরপর দুবার বিফল হয়ে কিছুদিন বাড়ি থেকে বেরনো একপ্রকার বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সেই সময় হঠাৎ কলেজের পুরনো নেশাটা চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। লেখালেখি করার। কবিতা নয়, গল্প। হাল ফ্যাশানের অণু পরমাণু গল্প নয়, বড় গল্প। তারপরেই ইন্টারভিউ দিয়ে এখানকার চাকরিটা পেয়ে যাই আমি। এককালে কলেজের পত্র পত্রিকায় দু' চারটে গল্প লিখেছিলাম। ইউনিভার্সিটির ম্যাগাজিনেরটা পুরো ছয় পাতার। টুকটাক প্রশংসাও পেয়েছিল সেগুলো। তারপর ওখানেই ইতি। কী করা যাবে? লেখালেখির জন্য যে পরিমাণ ধৈর্য ও পড়াশোনার প্রয়োজন তার বড্ড অভাব ছিল আমার। অভি খুব ভাল লিখত কবিতা। এখনও লেখা চালিয়ে যাচ্ছে সে। বিভিন্ন নামী অনামী হাউজের পত্রিকায়, কমার্শিয়াল ও লিটিল ম্যাগে তার লেখা বেরোয় প্রায় নিয়মিতই। দিন দশেক আগে পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ওকে আমার নব উদ্যমে লেখা একখানা গল্পের খসড়া দেখিয়েছিলাম। লেখাটা পড়ে অভি খুব একটা আশান্বিত না হলেও আমার ঘ্যানঘ্যানানির চোটে ওর চেনাজানা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিল আমায়। 'চেতনা' পত্রিকাটির ইদানীং বেশ নাম ডাক শুনতে পাই মননশীল পাঠকের মুখে। সেই পত্রিকার সম্পাদক মশাই আমাকে সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের চেতনায় একখানা বড় গল্প লিখে খুব তাড়াতাড়ি জমা দেওয়ার। সবটাই অভির রেকমেন্ডেশন। মনোনীত হলে সামনে শীত-সংখ্যায় সেটা ছাপবেন ওঁরা।

আর লেখালেখির চর্চার জন্য এই রকম নির্জন পাহাড়ি জায়গার চাইতে অনুকূল আর কী হতে পারে? তাই না?

আজ শনিবার। স্কুল ছুটি। খাওয়া দাওয়া সেরে সেই দুপুরের পর থেকে বারান্দায় বসে আছি রুলটানা লেখার খাতা, পেন আর নীল মলাটের নোটবইটা হাতে। ফ্লাক্স ভর্তি চা সাবাড় করেও একটা কালির আঁচড়ও

ফোঁটাতে পারিনি খাতায়। সামনে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সাদা থেকে লাল, লাল থেকে গোলাপি, গোলাপি থেকে ধূসর বহুবর্ণী ছোপ বদলাতে বদলাতে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। আমি তন্নতন্ন করে নোট বইয়ের পাতা উল্টেপাল্টে খুঁজছি। দূরে রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ ধুপি গাছের মাথার উপর থেকেও রোদ লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে ক্রমশ মিলিয়ে গেল অলীক পাখির মত নিঃসীমে। নোট বইয়ের ছোট ছোট কালো অক্ষরগুলো আরও দুর্বোধ্য হয়ে উঠল আমার কাছে। বেকুবের মত বসে থেকে থেকে গায়ে কাঁপুনি দিল একটা। ভাল শীত পড়ে গেছে সোনাদায়। পায়জামা পাঞ্জাবির উপর একটা শাল যথেষ্ট নয়। তার উপর আমি চিরটাকাল অল্প শীতেই কাতর।

কিন্তু শুধু কি শীতের কামড়? ছেলেবেলার প্রগলভতা আর সিরিয়াস লেখালেখির মধ্যেকার বিস্তর প্রভেদটা না বুঝে আজ নিজেকে যে এমন একটা লোক হাসানো পরিস্থিতিতে এনে ফেলব তা কখনও ধারণাও করতে পেরেছি কি আমি?

ভিতরে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। শীতের সঙ্গে সঙ্গত করে অন্ধকারটাও বেশ ভাল মতন জাঁকিয়ে বসেছে এতক্ষণে। ঘরে ঢুকে লাইটের সুইচে খটখট করলাম বৃথাই। পাওয়ার কাট। এটা অবশ্য সোনাদায় নিত্যদিনের ব্যাপার। অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে খাটের পাশের টেবিলে রাখলাম। এক কামরার ঘর। ছোট রান্নাঘর। একটা প্যাসেজ পেরিয়ে স্নানঘর। পাশে আরও একটা ঘর আছে তালাবন্ধ হয়ে। ওটা মনে হয় গৃহকর্ত্রীর স্টোরেজ। বাইরে রাস্তায় একটা কুকুর কী বিশ্রী সুরে ডেকে উঠল। ককিয়ে ককিয়ে কেঁদেই যাচ্ছে। মোমবাতির আলোটা কাঁপছে তিরতির। তার ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে ওপাশের দেওয়ালে। কোথাও কোনও আওয়াজ পর্যন্ত নেই। কী অদ্ভুত নীরবতা! উপর তলার ওদেরও বা সাড়া শব্দ পাচ্ছি না কেন কে জানে। একটা অস্বস্তিতে শরীরটা মুচড়ে উঠল আমার। ঠিক এই সময়টাতেই সবচাইতে বেশি মনে পড়ে কলকাতার রাস্তাঘাট, গড়িয়াহাটের দোকানপাট, জমজমাট বাঘাযতীনের মোড়, রসময়ী মিষ্টির দোকানের মাটির খুরির দই। আরও মনে পড়ে আমাদের বাড়ির সামনেটা। মায়ের হাতের হিং, নারকেল কুচি দিয়ে ছোলার ডাল। পাশের গলিতেই অভিদের বাড়ি। কাকিমার হলুদ মাখা আটপৌরে শাড়িতে রান্নার ঘ্রাণ। অভির ঘর। ওর বিছানা, বইয়ের তাক, পড়ার টেবিল আর টেবিলের উপর...।

উফ, কেমন যেন দম আটকে আসছে। নাহ, কারেন্টটাও আজ মনে হচ্ছে ভোগাবে। কাঠের মেঝের উপর জোরে জোরে ঠক ঠক আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। খানিক আগেও সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছিল পুরো পাহাড়টা। এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি মেঘ টেঘ সব উধাও। ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে জোনাকির মত ফুটে উঠেছে অজস্র উজ্জ্বল আলোকবিন্দু। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয় সামনে শত সহস্র নক্ষত্ররাশি জ্বলছে নিবছে। আর আমি দাঁড়িয়ে আছি মহাশূন্যে। শীত করছিল বলে ঘরে ঢুকেই শালের তলায় একটা জাম্পার পরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাইরে তাতেও ঠান্ডা মানছে না। অথচ কী এক অমোঘ আকর্ষণে আমার পা দুটো যেন পেরেক দিয়ে গেঁথে আছে বারান্দার কাঠের পাটাতনের সঙ্গে। নড়া চড়ার ক্ষমতাও হয়ত লোপ পেয়েছে আমার। এইভাবে কতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ মনে হল কেউ যেন খুব কাছ থেকে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এক ঝটকায় ঘাড়টা ঘোরাতেই দেখতে পেলাম ডানদিকে রাস্তার উপর মাত্র হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক লম্বা মতন ঘন ছায়া। ছায়াটা এবার নড়ে উঠল। দ্রুত এগিয়ে এল বারান্দায় যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তার সামনে।

একটা প্রবল আর্তনাদ প্রায় একটু হলেই বেরিয়ে আসছিল আমার মুখ থেকে! শেষ মুহূর্তে কোনওমতে সামলে নিলাম। একজন ভদ্রলোক। আগে দেখিনি কখনও এই অঞ্চলে। মাঝবয়সী। গায়ের রঙ ময়লা। চোখে পড়ার মত দীর্ঘ উচ্চতা। ধূসর রঙের স্যুট ট্রাউজার, মাথায় কাঁচা পাকা চুল। খুব বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন উনি, 'বাঙালি?'

—'হ্যাঁ।' বললাম আমি। এখনও বুকের ভিতরে ড্রাম বাজছে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে দু' চারটে কথা বলে জানলাম যে ওঁর নাম বিপিন সমাদ্দার। বাড়ি দিঘার কাছে এগরায়।

ঘরে ঢুকে লাইটের সুইচে খটখট করলাম বৃথাই। পাওয়ার কাট। এটা অবশ্য সোনাদায় নিত্যদিনের ব্যাপার। অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে খাটের পাশের টেবিলে রাখলাম। বাইরে রাস্তায় একটা কুকুর কী বিশ্রী সুরে ডেকে উঠল। ককিয়ে ককিয়ে কেঁদেই যাচ্ছে। মোমবাতির আলোটা কাঁপছে তিরতির। তার ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে ওপাশের দেওয়ালে। কোথাও কোনও আওয়াজ পর্যন্ত নেই। কী অদ্ভুত নীরবতা! উপর তলার ওদেরও বা সাড়া শব্দ পাচ্ছি না কেন কে জানে। একটা অস্বস্তিতে শরীরটা মুচড়ে উঠল আমার।

উনি প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। এখানে একটা পুরনো কেসের ব্যাপারে এসেছেন। অন্ধকারে হাইওয়ের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাছাড়া খুব জলতেষ্টাও পেয়েছে ওঁর। সুতরাং ভদ্রতা করে লোকটাকে ঘরে ডেকে এনে বসাতে হল।

বিপিনবাবু খাটের পাশে রাখা চেয়ারে বসে টেবিল থেকে জলের জাগটা তুলে নিয়ে ঢকঢক করে জল খেতে লাগলেন। খুব তেষ্টা পেয়েছে তা বোঝাই যাচ্ছে। চা অফার করব কিনা ভাবছি। এমন সময় দেখি উনি জলের জাগটা নামিয়ে রেখে টেবিলের উপর আমার লেখার খাতা আর নোটবুকটার দিকে তাকিয়ে আছেন আর তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে এক টুকরো বিষণ্ণ হাসি। কিছুক্ষণ আগের অস্বস্তিটা আবার আমার বুকের ভিতরে ঘাই মারতে শুরু করল।

'লেখালেখির শখ আছে মনে হচ্ছে ইয়াং ম্যান? সংসার করেছেন? না এখনও করা হয়ে ওঠেনি? কী লেখা হয়? কবিতা?'

'নাহ, গল্প। ওই একটু আধটু চেষ্টা করছি আর কী।' দায়সারা উত্তর দিয়ে কথা ঘুরিয়ে বললাম, 'চা খাবেন? আমি নিজের জন্যে বানাতেই যাচ্ছিলাম।'

আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে তৎক্ষণাৎ নোটবুকটাকে পাচার করে দিলাম কাঠের দেওয়ালে আটকানো হুকে ঝুলন্ত আমার স্কুলে নিয়ে যাওয়ার কাপড়ের ব্যাগে।

চায়ের কথায় ভদ্রলোকের চোখ দুটো চকচক করে উঠল, বললেন, 'তা এই ঠান্ডার মধ্যে, বুঝলেন না, মনটা অন্য জিনিস চাইছিল, সে যাই হোক। চা পেলেই বা মন্দ কী?' উনি উঠে কাচের জানালার ওপারে চাইলেন। আবার পাহাড়ের নীচ থেকে দলে দলে ভেসে আসা মেঘে ঢেকে গিয়েছে চরাচর। দূরের আলোগুলো সব অদৃশ্য। থমথমে অন্ধকার আর নৈঃশব্দ বিরাজ করছে চারিদিকে। সঙ্গে হাড় কাঁপানো শীত। আমি কিচেনের স্ল্যাবে রাখা স্টোভটা জ্বালিয়ে ফেলেছি ইতিমধ্যে। কেটলিতে চায়ের জল ফুটছে। যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল ভদ্রলোকের স্বর, 'যদি গল্প লিখতে চান, তাহলে আমি আপনাকে একটা প্লট দিতে পারি। শুনবেন?'

অগত্যা! মনে মনে ভাবি আমি। কারেন্টটাও আসছে না একঘণ্টা ধরে। কোথাও বড়সড় ফল্ট হল নাকি? অদ্ভুত! ঝড় নেই বৃষ্টি নেই, শুধুমুধু এতক্ষণ ধরে..? কৌটোগুলো নাড়াচাড়া করলাম। একটা ভাল বিস্কিটও নেই ঘরে। চা-পাতাও ফুরিয়ে এসেছে। এটা হচ্ছে বিগত সপ্তাহ দেড়েক এখানে না থাকার ফল। কাল একবার স্কুল ফেরতা কিষণ বাহাদুরের স্টেশনারি দোকান থেকে মাসের জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হবে।

ওদিকে বিপিনবাবু বলে চলেছেন, 'ধরুন গল্পটা আমার নিজেরই জীবনেরই কাহিনি। বর্ধমানের এক ছোট মফস্বল অঞ্চলে চাকরিতে প্রোমোশন নিয়ে বদলি হয়ে গিয়েছিলাম আমি। নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপূর্ণ জায়গা। নির্বিঘ্নেই ছিলাম। অনেকটা আপনারই মত। তবে আপনার মত ব্যাচেলার কিন্তু ছিলাম না। গিন্নী ছিলেন। দীর্ঘ সতের বছরের দাম্পত্য! অ্যাহ্! সোজা কথা?' খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

'আর ছেলেমেয়ে?' ওঁর দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিতে দিতে নেহাত কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করলাম আমি।

প্রশ্নটা শুনেই ছায়া ঘনালো ওঁর মুখে। স্টোভটা নিভে যাওয়ার দরুণ ঘরের ভিতরে জ্বলতে থাকা শুধুমাত্র একটা মোমবাতির আবছা আলোতেও সেটা চোখে পড়ল আমার।

'নাহ মশাই। ওই একটা ব্যাপারে বঞ্চিত ছিলাম আমরা। আর সেটাই ছিল আমাদের সম্পর্কের মধ্যের সবচাইতে বড় সমস্যার কারণ।' চায়ে একটা লম্বা চুমুকদিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন উনি।

এই রে! এখন কি ভদ্রলোক তাদের সাংসারিক জটিলতার গল্প শোনাতে বসবেন? উনত্রিশ বছরের এলিজিবল ব্যাচেলার আমি। মা আর দিদি ছাড়া জীবনে অন্য নারীদের সান্নিধ্য লাভের সেরকম সৌভাগ্য ঘটেনি। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিয়ে নিয়ে একটা ফ্যান্টাসি, একটা রোমান্স আছে আমার মনের গহনে। খামোখা সেটাকে বিষিয়ে দেওয়ার কি খুব প্রয়োজন আছে লোকটার?

অদ্ভুত ভাবে আমার মনের কথা যেন পড়ে নিলেন ভদ্রলোক। কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'হতাশ হবেন না মশাই। কোনও দাম্পত্য কলহের প্লট দিচ্ছি না আমি আপনাকে। বরং এই গল্পটা অন্য একজনকে নিয়ে।' স্বল্প বিরতির পর ওর মুখ থেকে দুটো শব্দ বেরল, 'একটা প্যাঁচা।'

'প্যাঁচা?' আমার অবাক চাহনিকে এতটুকু আমল

না দিয়ে উনি বলতে থাকলেন, "আমাদের বর্ধমানের অফিসে, বুঝলেন, আমার নির্দিষ্ট বসবার টেবিলটির পাশে একটা বড় জানালা ছিল। পাল্লাগুলো কাচের। খুব শীত বা বৃষ্টি ছাড়া বাকি সময় খোলাই রাখতাম জানালাটা। আমার আবার মশাই বদ্ধ জায়গায় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কাজ করতেই পারি না। সে যাই হোক, ওই জানালার ঠিক দুই হাত দূরত্বেই ছিল একটা পুরনো অশ্বত্থ গাছ। গাছের গায়ে একটা বড়ো সড়ো কোটর। সেদিন কোনও কারণে ডিপ্রেশন মত চলছিল। আমি একমনে টেবিলে বসে কাজ করছি। সামনে কেস ফাইলের পাহাড়। সামান্য আগেই হালকা বৃষ্টির পর ওয়েদার দিব্যি ক্লিয়ার হয়ে গেল। আমিও ওমনি উঠে গিয়ে জানালার পাল্লা দুটো ঠাস ঠাস করে খুলে দিয়ে আবার টেবিলে বসতে যাব, দেখি একটা বিশাল বড় প্যাঁচা গাছের ডালে বসে একভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। আগে কখনও দেখিনি ওটাকে। আর শুধু চেয়ে রয়েছে বললে ভুল বলা হবে। বড় বড় ভাঁটার মত দুটো চোখ দিয়ে আমায় যেন গিলে ফেলতে চাইছে। কিছুক্ষণ ওই চোখের দিকে চাইলে, কী বলব, হাত পা যেন সব ঠান্ডা হয়ে আসে। আমি একটু থতমত খেয়ে টেবিলে বসে একটা ফাইল টেনে নিলাম কিন্তু বুঝতে পারলাম ওই দুটো চোখ তখনও আমায় ফলো করছে।"

'ভর দুপুরে প্যাঁচা? থানায় আর কাউকে ডেকে দেখান নি সেটাকে?' একটা হাই চেপে অধৈর্য গলায় বললাম। সত্যি কথা বলতে কী ভদ্রলোকের গল্পটায় কোনও ইন্টেরেস্ট পাচ্ছি না আমি।

'টিফিন শেষ করে একে একে যখন সবাই ঘরে ঢুকতে লাগল আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ওটা আর ওখানে বসে নেই। হয়ত উড়ে গেছে কোথাও।'

বাঁচা গেছে। মনে মনে বলি আমি। মুখে বলতে হয়, 'ওহ্, তারপর?'

"তারপর দু'হপ্তা ওটার আর কোনও পাত্তা নেই। দিব্যি অফিস করছি। অফিসের পর ক্লাবে তাস খেলছি। খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ দিন তিনেক পরে দেখলাম আবার ওটাকে। সেদিন আমাদের এক গ্রুপ-ডি স্টাফের ছেলের মুখেভাত উপলক্ষে আমাদের অফিস শেষে ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। সবাই মিলে দল বেঁধে রওনা হওয়ার পর বক্সীই প্রথম খেয়াল করল অফিস থেকে যে সোনার আংটিটা উপহার হিসেবে দেওয়া হচ্ছে সেটা রয়ে গেছে আমার ড্রয়ারে। আনতে ভুলে গেছি বেমালুম। থানার ঠিক বাইরে ছাতিম গাছটার নীচে সোজা রাস্তাটার মুখে সবাই দাঁড়িয়ে রইল আমার অপেক্ষায় আর আমি চাবি হাতে দৌড়ে গেলাম অফিসে। সবে সন্ধে হয়ে এসেছে তবে আলো পুরোপুরি মরে যায়নি। সেই ম্লান আলোয় আবার চোখাচুখি হল তার সঙ্গে। চোখ সরিয়ে নিচ্ছি, ভাবছি যে চলে গেছে আপদটা! আবার তাকাচ্ছি, দেখছি যে, না তো? স্থির শীতল দৃষ্টিতে ও কুটিলভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ঘামতে ঘামতে কাঁপা কাঁপা হাতে কীভাবে যে ড্রয়ারটা খুললাম আর আংটিটা নিয়ে কতক্ষণে পৌঁছলাম দলের লোকেদের কাছে সেটা মনে নেই।"

'আপনার মনের ভুল নয়ত? খামোখা একটা প্যাঁচা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে যাবে কেন হঠাৎ? হতে পারে যে গাছগাছালির ফাঁকফোকর দিয়ে চুইয়ে আসা আলো আবছায়ার তৈরি কোনও হ্যালুসিনেশন ছিল ওটা? আদৌ প্যাঁচাটার অস্তিত্বই নেই?' নিজের অজান্তেই কখন যেন লোকটার বিচিত্র গল্পটির মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমি।

'না ভাই না, ভুল আমার হয় নি।' ভদ্রলোক জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'আর সেদিনই রাতে ঘুমতে গিয়ে বিছানায় অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ঘটনা দুটোকে একটা সূত্রে বাঁধতে পেরেছিলাম আমি।'

আমার 'কীরকম?' প্রশ্নের উত্তরে বিপিনবাবুর মুখে চোখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত গ্লানি। একটা অনুশোচনার ভাব। "কী আর বলব বলুন? আপনি বয়সে অনেক ছোট আমার থেকে। আসলে ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমরা প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস। কারোর মধ্যে আবার কোনও কোনও রিপু অত্যন্ত প্রকট। সুন্দরী রমণীদের প্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ থাকে সব পুরুষেরই। থাকে তাদের ভোগ করবার লালসা। আমার মধ্যেও ছিল। একটু বেশিই ছিল। অস্বীকার করার কিছু নেই। আমার স্ত্রী কম বয়সেও কখনও আমার সে চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। শরীর নিয়ে ওর ছিল জঘন্য কিছু সাইকলজিকাল প্রবলেম, ঘেন্না, পাপবোধ। একটা ছেলেপুলে হলে বোধহয় স্বাভাবিক হয়ে যেত সম্পর্কটা। সেটাও তো আর... যাই হোক, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুগার, হার্টের প্রবলেম এইসব দানা বাঁধতে লাগল। অসুখ আরও বেশি খিটখিটে করে তুলল ওকে। সাঁইত্রিশেই ওকে দেখাত প্রায় সাতান্নর কাছাকাছি। কখনও কাছে ঘেঁসতেই দিত না আমায়। কিন্তু তখন আমার প্রবল খিদে! আমি কোথায় যাই?'

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন বিপিনবাবু। কাঠের মেঝেতে ওর পায়ের আওয়াজ হতে লাগল। আমি খাটে বাবু হয়ে বসে আছি স্থাণুবৎ। জানালার দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বলতে থাকলেন উনি, "আমরা যেখানে ভাড়া থাকতাম ওই একই বাড়িতে দোতলায় ওর মায়ের সঙ্গে ভাড়া থাকত শিল্পী। বর খুব অত্যাচার চালাত পণের টাকা বাকি থাকায়। তাই পালিয়ে এসেছিল বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে। আর যায়নি। তেইশ চব্বিশ বয়েস হবে, দেখাত আরও কম। খুব আহামরি সুন্দরী কিছু নয়। কিন্তু ওর অপূর্ব লালিত্য মাখা শরীরের দাম্ভিক ভাঁজগুলো আমার চেতনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এত ফেমিনিন লুক! আমার সমগ্র পুরুষ সত্ত্বাটাকে মেয়েটা যেন এক আঙুলের ইশারায় ঘাড় ধরে ওর পায়ে এনে ফেলেছিল প্রথম দেখাতেই। আমার গিন্নীর কাছে সেলাই না কী শিখতে আসত সে রোজ সন্ধেবেলায়। বাটি চালাচালিও ছিল দুই ঘরে। সেদিনও বোধহয় কী একটা তরকারি দিতে এসেছিল সকালে, আমি অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার আগে। গিন্নী সদ্য স্নানে গিয়েছে। আর ওর স্নান মানে জানেন তো? ছুঁচিবাই হলে যা হয়। পাক্কা এক ঘণ্টা। আমার মাথার ঠিক ছিল না। সুযোগটা কিছুতেই হাতছাড়া হতে দিতে পারলাম না। শোবার ঘরে বিছানায় টেনে নিয়ে গিয়ে হালকা আদর। প্রথমে ও এতটাই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টাই করেনি। তারপর খানিক ছটফট করল। তখন একটু জোর খাটাতেই হল। আহা, বেশি কিছু করিনি। বিশ্বাস করুন। তাতেই মেয়েটা কেঁদে কেটে অস্থির। ওকে নরমে গরমে বুঝিয়ে ঠান্ডা করলাম। অসুস্থ বিধবা মা আর স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে। সংসার চালাতে প্রাণান্ত! কিছু টাকা দিয়ে শেষে মুখ বন্ধ করতে হল ওর। সেদিনই অফিসে গিয়ে প্রথম প্যাঁচাটাকে দেখি।"

'আর পরের বার?' জিজ্ঞেস করব না ভেবেও মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল। লোকটার প্রতি ঘৃণা জন্মাচ্ছে আমার।

'পিওন বাবুরামের ছেলের উপহার কেনার দায়িত্ব ছিল আমার আর বক্সীর উপরে। থানায় ঢুকে সাইন করেই বেড়িয়ে পড়েছি দুজনে টাকা নিয়ে স্বর্ণ ভাণ্ডারের উদ্দেশে, সাডেনলি বক্সীর মোবাইলে ওর শ্বশুর বাড়ি থেকে ফোন এল। ওর শ্বাশুড়ির বাড়াবাড়ি অবস্থা। বক্সী তাড়াহুড়ো করে আমার হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে বলল, সমাদ্দারদা, আপনি কাইন্ডলি ম্যানেজ করে নিন। আপনার পছন্দের উপর আস্থা আছে আমাদের। আমি বিকেলের আগে এসে আপনাদের সঙ্গে জয়েন করব। শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় খেলে গেল প্ল্যানটা। পিওনের ব্যাটাকে আবার অত দামি আংটি দিয়ে কী হবে? ম্যানেজ যা একটু করলাম তা ওই স্বর্ণ ভাণ্ডারের মালিককে। চলে এল হাতে কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ। গিন্নীর ওষুধ আর টেস্টের ঠ্যালায় তো বাড়তি এক পয়সা থাকে না মাসের শেষে। এটা দিয়ে শিল্পীকে হাতের মুঠোয় আনা যাবে! ভাবনাটায় বড্ড পুলক ছিল জানেন?'

'সেদিনই অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে সন্ধেবেলা আবার দেখলেন প্যাঁচাটাকে তাই তো?' আমিও এতক্ষণে মনে হল খুঁজে পেয়েছি যোগসূত্রটা।

বিপিনবাবু এবারে ওঠবার তোড়জোড় করছেন, 'যাই, রাত হল। সামনের রাস্তাটা দিয়ে সোজা বেরলেই হাইওয়েতে উঠব, তাই না?'

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান, পুরোটা তো শোনাই হল না। তারপর কী হল? আর দেখেননি প্যাঁচাটাকে কখনও?' আমি ওঁকে বাধা দিয়ে বললাম।

যেন খুব অনিচ্ছা নিয়ে উঠতে গিয়েও চেয়ারে বসে পড়লেন বিপিনবাবু, বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে এমনভাবে থেমে থেমে বললেন, "হল দেখা। বিধাতার লিখন! দেখা না হওয়ার যো আছে? সেদিন শনিবার। গিন্নী সকালে স্নানটান সেরে পুজো দিতে গিয়েছিল বারের মন্দিরে, প্রত্যেক শনিবারেই যায়। আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম শিল্পীকে। তখন লক্ষ্মী মেয়ের মত আমি যা বলছি তাই মানছে ও। বেহিসাবী হবার প্রস্তুতি নিয়েই ছিলাম মনে মনে। নির্দিষ্ট সময়ে দরজায় টোকা পড়ল। একটা পাতলা সিফনের শাড়ি আর স্লিভলেস ব্লাউজে ওকে যা দেখাচ্ছিল না সেদিন! সবেমাত্র জড়িয়ে ধরেছি, আঁচল সরিয়ে ঠোঁট রেখেছি ওর বুকের নরম উপত্যকায়, হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে গেল। ছিটকিনিটা দেবার কথাও খেয়াল নেই। এমনই কপাল। গিন্নীর বোধহয় আগেই কোনও সন্দেহ হয়ে থাকবে। শিল্পী আমার দিকে খর চোখে তাকিয়ে দৌড়ে পালাল। কে জানে ওদের দুজনের মিলিত চক্রান্তই ছিল কিনা? আমার স্ত্রী কিন্তু একটি অভিযোগও জানাল না আমায়। শুধু শুকনো মুখে অদ্ভুত একটা চাহনিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। সারাদিন অফিসে ফাইলে মুখ গুঁজে বসে ছিলাম। জানালাটার দিকে ভয়ে তাকাতেই পারিনি একবারও। বাড়ি ফিরে দেখি ঘর শূন্য। আমায় মুক্তি দিয়ে চলে গিয়েছে আমার সতেরো বছরের সহধর্মিণী।'

ভদ্রলোক এবার বাস্তবিক ভাবেই দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "অনেক খোঁজাখুঁজি। সব ব্যর্থ। মাঝখান থেকে বাড়ি পাল্টালাম। যে থানায় কাজপাগল বলে এত সুনাম ছিল আমার, সেখানে গিয়েও সকাল থেকে সন্ধে তাড়া করে বেড়াত আমাকে জানালাটা। না তাকিয়েও যেন দেখতে পেতাম মাথার পিছনে সর্বক্ষণ একজোড়া তীব্র ভয়ঙ্কর শ্বাসরোধী দৃষ্টি! সব কাজে ভুল হয়ে যাচ্ছিল জানেন। দুবার সাহেব ডেকে ওয়ার্নিং দিলেন। এই সমাদ্দারকে। ভাবতে পারেন। কিছুদিন বাদে আর সহ্য হল না। ট্রান্সফারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়ে দিলাম।"

দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে শেষবারের মত ঘুরে তাকালেন বিপিনবাবু, "অফিসের শেষ দিন সবার আগে

পৌঁছলাম আমার প্রিয় টেবিলটার কাছে। কিছু পেন্ডিং আগেকার ফাইল এখনও পড়ে রয়েছে টেবিলের কোণায়। নির্ভীকভাবে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে এক হ্যাঁচকায় পাল্লা দুটো দিলাম খুলে। হ্যাঁ। ওই তো একই জায়গায় বসে আছে ঘৃণ্য জীবটা। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম এবার ওটার দিকে। চোখে চোখ রেখে খুব ঠান্ডা মাথায় আমার সার্ভিস রিভলবার দিয়ে পর পর তিনটে গুলি করলাম ওর কপালে। পরিষ্কার দেখলাম ধড়ফড় করতে করতে প্যাঁচাটা পড়ে গেল গাছতলায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওখানে দৌড়ে গিয়ে মাঠে তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওটাকে আর কোথাও খুঁজে পেলাম না। তবে কি মরেনি? উন্ডেড হয়েছিল প্যাঁচাটা? কে জানে? আসি।”

খটাস খটাস শব্দ করে হাওয়ায় কাঁপছে দরজার পাল্লাদুটো। লোকটা চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। আশ্চর্য! কখন যেন এরই মধ্যে এসে গেছে ইলেক্ট্রিসিটিও। টেরই পাইনি। হাতঘড়িতে দেখলাম ন'টা চল্লিশ। মাত্র! খাবার দাবার সব ওবেলাতেই বানিয়ে রাখা আছে। শীতের দেশ। নষ্ট হবার কোনও ভয় নেই। এবার খেয়ে দেয়ে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে লেপের ভিতরে ঢুকে পড়ব। হু! গপ্পো শোনাতে এসেছে। যত্তসব গাঁজাখুরি প্লট! প্যাঁচা, আর কিছু পেল না। একটা চরিত্রহীন লম্পট। আমার কপালেই জোটে এসব মাল।

শোবার পর কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করলাম। নাহ, ঘুম আসছে না কিছুতেই। মাথাটা একেবারে ঘেঁটে দিয়ে গেছে মক্কেল। বাথরুমে গেলাম। মুখে চোখে জল দিয়ে আসলাম। তারপর শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমটা এসে গেল।

ঘন জঙ্গল। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। আমি একটা বুড়ো অশ্বত্থ গাছের ডালে বসে আছি। বসে বসে পা দোলাচ্ছি আরামে। হঠাৎ নিচে চোখ পড়তে দেখলাম গাছটার শিকড়গুলো উপরের দিকে মাটি ফুঁড়ে লম্বা হতে হতে ছুঁয়ে ফেলল আমাকে। আর তারপর সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আঁকড়ে ধরল আমায়। প্রবল চাপে দম আটকে আসছে। সাহায্যের জন্যে এদিক ওদিক চাইলাম। আমার অসহায় চোখদুটো দেখতে পেল ওই গাছেরই অন্য একটা ডালে আমার দিকেপিছন ঘুরে দিব্যি বসে রয়েছে অভি। ওর লেখা কবিতা আওড়াচ্ছে। আমার বুকফাটা গোঙানির আওয়াজে মুখটা এদিকে ঘোরাল এবার। অভির কপালে তিনটে গভীর ক্ষত! যেন কেউ ছুটন্ত বারুদ ঠুসে দিয়েছে সেখানে। ওর চোখের তীব্র চাহনি আমার চেতনা লোপ করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

চরম আতঙ্কে ঘুমটা ভেঙে গেল। সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ। ঝকঝকে রোদ্দুর এখন চারপাশে। পাখপাখালির কিচিরমিচির, উপরের তলার বাচ্চা দুটোর পায়ের ধুপধাপ শব্দে ঘোর লাগা ভাবটা কিছুটা কমল। লেপের ভিতরে ঘামে ভিজে সপসপ করছে সর্বাঙ্গ। উফ কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা! গলা শুকিয়ে কাঠ। হাঁপাতে হাঁপাতে টেবিলের উপরে জলের জাগটা হাতড়াতে গিয়ে যেন হাতে ইলেকট্রিক শক খেলাম। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। একী? সেই নীল নোটবুকটা টেবিলের উপর কোথা থেকে এল। কাল তো যতদূর মনে পড়ছে ওটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম স্কুলের ব্যাগে! তবে কি কেউ এসেছে নাকি ঘরে? না না, তা কীভাবে সম্ভব? দরজা তো বন্ধ ছিল ভিতর থেকে। এদিক ওদিক চাইলাম একবার। এমনভাবে খোলা রয়েছে নোটবুকটা যেন এখনই কিছু লেখা হচ্ছিল সেখানে। কালো কালির খুদি খুদি অক্ষরগুলো যেন ব্যঙ্গ করছে আমার দিকে তাকিয়ে। বলছে, 'বলও, পারলে একটা অক্ষরও লিখতে?' আমি দুহাত দিয়ে খামচে ধরলাম মাথার চুল।

আমার প্রিয় বন্ধু অভির বহুদিনের প্রচুর পরিশ্রমের ফসল একটি সুবৃহৎ উপন্যাসের ম্যানুস্ক্রিপ্ট আসলে ওই নীল রঙের নোটবুকটা। অভির মুখটা কী জ্বলজ্বল করছিল যখন সে আমায় দেখাচ্ছিল ওর লেখাটা প্রথমবার। অভি বলছিল, 'বুঝলি? এবারে গদ্যের দিকে ঝুঁকছি। আসলে অনেকদিন থেকেই টুকটুক করে লিখে রাখছিলাম মাথায় ঘোরাফেরা করা ভাবনা চিন্তাগুলোকে। এই বিচিত্র দুনিয়াটায় এত বিভিন্নতায় ভরা জটিল চরিত্ররা, লিখে না রাখলে খেই হারিয়ে যাবে যে। ভুলে যাব স-ব। জানিসই তো, কেমন আনমনা মানুষ আমি। এই লেখাটা প্রকাশিত হলে যা দাঁড়াবে না ব্যাপারটা! পাঠক নতুন করে চিনবে আমায়।'

ঠিক তার পরের দিন অভিদের বাড়িতে বিজয়া করতে গেছিলাম। অভি ছিল না। ও তখন ওর কবি বন্ধুদের সঙ্গে মেতে উঠেছে কোনও এক সাহিত্য সভায়। বিজয়া সম্মিলনীর কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে। চিরকালই

নির্ভীকভাবে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে এক হ্যাঁচকায় পাল্লা দুটো দিলাম খুলে। হ্যাঁ। ওই তো একই জায়গায় বসে আছে ঘৃণ্য জীবটা। পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম এবার ওটার দিকে। চোখে চোখ রেখে খুব ঠান্ডা মাথায় আমার সার্ভিস রিভলবার দিয়ে পর পর তিনটে গুলি করলাম ওর কপালে। পরিষ্কার দেখলাম ধড়ফড় করতে করতে প্যাঁচাটা পড়ে গেল গাছতলায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওখানে দৌড়ে গিয়ে মাঠে তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওটাকে আর কোথাও খুঁজে পেলাম না। তবে কি মরেনি? উন্ডেড হয়েছিল প্যাঁচাটা?

কবিদের নিয়ে সুন্দরী মেয়েদের ন্যাকামো সীমাহীন। হয়ত আজও ওকে ঘিরে রয়েছে তিন চারটি যুবতী মেয়ে। যত আদিখ্যেতা! চট করে ওর টেবিলের উপর থেকে নোটবুকটা তুলে নিয়ে জামার ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললাম। সেদিন সন্ধের ট্রেনেই ছিল আমার ফিরে আসার রিজারভেশন। গভীর রাতে মোবাইলে যখন অভির ফোনটা এল তখন ওর গলাটা কী করুণ শোনাচ্ছিল! যেন সর্বস্ব খোয়া গিয়েছে ছেলেটার। কিছুই জানি না এমন ভান করে কেটে দিয়েছিলাম লাইনটা।

চুলোয় যাক স্কুল আজ। নীল নোটবইটা বুকে আঁকড়ে ধরে আমি এখন ছুটছি পোস্ট অফিসের দিকে। রেজিস্টার পোস্ট করে অভির জিনিস ওকে ফেরত দেব, সর্বান্তকরণে ক্ষমা চেয়ে। তারপরে বন্ধুত্ব থাকলে থাকবে, না থাকলেও কিছু করার নেই আমার। ওহ, হ্যাঁ, আরও একটা কাজ আছে। 'চেতনা'র সম্পাদক মশাইকে একটা চিঠি পোস্ট করতে হবে। যার বয়ানটা হল, আপনি আমায় মাফ করবেন। গল্প লেখা আমার দ্বারা হবে না।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

মহারাণী কথা

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

সম্রাজ্ঞীর রাজনগরের পাঠ-পর্ব শেষ। বাবা মাকে ছেড়ে থাকতে হবে ভেবে একদিকে শূন্যতা অন্যদিকে ভরে থাকা মহারাণীর সুবাস। কখন যে সুনীতি যাপনে মিশিয়ে নিয়েছে নিজস্ব যাপন কথা। একের পর এক মহারানীর হয়ে ওঠা ছবি মনের আনাচ কানাচে। কলেজের শেষ বিদায়ী অনুষ্ঠানের পর বন্ধুরা মিলে রাতের আবছায়া আর গোধূলি জুড়ে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ থেকে শুরু করে রাজবাড়ি, তাদের স্বপ্নের রাজবাড়ি আর মহারাণীর ছায়া লেগে থাকা মাটি আর একবার নতুন করে স্পর্শ করে। সুনীতির মধ্যবয়সের দুঃখ যন্ত্রণাগুলো ঘিরে থাকে রাতের অন্ধকার। বাবা মাকে ছুঁয়ে চিরকালীন ঘিরে থাকার গান গায়।

১৬.

নিশিময়ী তো খুব ক্ষুব্ধ। আহারে! ছেলেটার মন যে এই একরত্তি মেয়ে কী করে মজালো! আরও দু' চারটে বিয়ে না হলে পৌরুষ ব্যঞ্জনা ধরে রাখার কী হল, না না না মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ অবাধ্য যেমন হয়েছিলেন বিয়ের সময়-ই, এই মেয়ে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না, আবার একই ভাবে প্রেমের জয় পতাকা উড়েছিল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। সুনীতির সব কাজের একান্ত আপন সহচর। সহযোগী মহারাজা। কেশবচন্দ্রের আদর্শ প্রচারেও সুনীতিদেবীর পাশে থেকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

এতদিন পর নিবেদিতা একাডেমি নামের নতুন স্কুল ঘরের পাশে ব্রাহ্ম উপাসনালয়ের সামনে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত চিত্রকল্প স্বপ্নের মত। উপাসনা গৃহের বর্তমান যে রঙ সেটা অফ হোয়াইট। সত্যি সুন্দর হয়ে উঠেছে সব মিলে এ চৌহদ্দি। বিকেলের আলোয় একদল ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নাটক শিখতে এসেছে। ওদের পাশ দিয়েই হেঁটে উপাসনা গৃহের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস সম্রাজ্ঞী এখনকার সম্রাজ্ঞী, সেই চার উঠোন, সোহাগিনীর আঁচল ছেড়ে, রাজীবের স্নেহের ছায়াটুকু ছেড়ে সত্যিই যে চলে গিয়েছিল পড়বে বলে, ঐ মহারানীর মত উদার সংস্কারহীন নারী হবে বলে। সেই সম্রাজ্ঞী যে এ মাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে সারারাত কেঁদেছিল লুকিয়ে। 'লুকিয়ে' কারণ, রাজীব জানলে পড়াটড়া সব শিকেয় উঠতো যে! ঠিক একমাস, তারপর দুমাস থেকে তিন, মিশে গেল মেয়েটা ডিপার্টমেন্টের আবছায়া মন কেমন করা পরিবেশে। একদিকে তীব্র প্রতিজ্ঞা— ভাল করতেই হবে, রেজাল্ট তো মনে রাখার মত। কিন্তু ঐ যে দ্বিতীয় বছরে এসে একেবারে ফাইনাল পরীক্ষার দিন রাজীবের চিঠি এল, তাও সাতদিন আগের লেখা।

রাণী,

মা আমার, মন দিয়ে পড়াশুনো কর। পাশাপাশি সব কিছুই করবে। এগিয়ে যাবে আর আমার শরীর খারাপের খবর পেলে বড় বেশি মন কেমন করে তোমার। সেটা করো না। ইউনিভার্সিটিতেই মন দিয়ে সব কাজ করো।

শুভার্থী বাবা।

এইরকম কত যে চিঠি যত্নে তোলা আজও সম্রাজ্ঞীর কাছে গোপন মণিকোঠায় কোহিনূরের মত। আসলে এরই নাম তো জীবন। পূর্বসূরীর পদ্মছায়ায় বেড়ে উঠছে আজ যে শিশুরা তারাই একদিন গুরুজনদের জায়গা নিয়ে কর্তৃত্ব করে, তারাও তাদের মত ছবি তৈরি করে, আবার পরবর্তী মানুষের জন্য এমন ফ্রেম তৈরি করে রাখে, যেখানে সহজেই এরা খাপ খেয়ে যায়।

উপাসনা গৃহে চটি খুলে ঢুকতে গিয়েই মাথার উপর দিয়ে চামচিকের উড়ে উড়ে যাওয়ার দৃশ্যত দেখে সম্রাজ্ঞী। চমকে ওঠে। ভিতরে বেদিতে কেউ নেই। কিন্তু ঘন্টাধ্বনি উঠছে কেন! শুনতে পাচ্ছে চোখ বন্ধ রেখে রামমোহন অথবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত সেই সব গান... নিরীশ্বরবাদীর রূপৈশ্বর্যের বর্ণনায় আর নিজস্ব নিরাসক্ত ভাব কল্পনায় বেজে ওঠে সুর। সম্রাজ্ঞীর বুকের ভিতর রিন রিন করে ওঠে উপাসনার সুর। প্রাণপণে দাঁড়ানো সম্রাজ্ঞী কখন সুর তুলেছে...তুমি আমাদের পিতা/পিতা বলে যেন জানি/তোমায় নত হয়ে যেন নমি/....

সিকিউরিটি অবাক হয়, রিহার্সাল ফেলে ছেলেমেয়েরাও কেউ কেউ খেলতে খেলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ভারতীয় নারীদের মধ্যে অনন্যা বলেছিলেন লেডি কারমাইকেল। সুনীতির শিরে ঐ অপূর্ব শিরস্ত্রাণের সঙ্গে মিশে আছে ওনার সার্বিক দীপ্তি। ব্রাহ্ম মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন হয়েছিল মহারাণীর একান্ত ইচ্ছেয় আর মহারাজার অর্থানুকুল্যে ১৮৮৬তে।

অপূর্ব ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে। মিশে যাচ্ছে সম্রাজ্ঞীর স্বর। রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষা, শিক্ষাগুরু যোগীন রায়কে চোখ বুজলেই দেখতে পায় রাণী। সব কেমন স্বপ্নের মত। তবু ছুঁয়ে দেখতে সাধ হয়।

সেই যে ছেড়ে চলে যাওয়া রাজনগর, ভূমি থেকে কি কেউ উপড়ে নিতে পারে সবটুকু, সেই স্কুল চৌহদ্দির পুকুর ধার... বন্ধুরা মিলে সাপের ভয়ে দিশেহারা, কে যেন বলছিল বাবা মহাদেবের স্থান রে স্কুলের পিছন

দিকটা। যেমন রাজার বাড়ি নিয়েও কত গল্প কথা কত আখ্যান, তেমনি স্কুলের বহু প্রাচীন শিকড় হয়ে যাওয়া বটবৃক্ষ, ছাত্রী সময়ে তো তলিয়ে দেখেনি, আজ এতগুলো বছর পর এসে দাঁড়িয়েছে সে খিলানের ধারে। যে কলেজে চুটিয়ে লেখাপড়া, পত্রিকা আর পার্টি রাজনীতির সামান্য গন্ধে গন্ধে প্রথম প্রেম হয়ে ঢুকে পড়া তরুণ মুখ সব একেবারে সম্রাজ্ঞীকে জড়িয়ে নিচ্ছিল পাকে পাকে। আসলে আজ তো একাই এসেছে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে... এসে পৌঁছতেই লেগে গেল বহুক্ষণ। এনজেপি, জলপাইগুড়ি রোড মোটামুটি একরকম, লেট থাকলেও সকাল সাড়ে আটটা, তার পর শুরু ধুক ধুক ধুক ধুক। ওদিকে ভিআইপি সুটকেস গুছিয়ে পূর্ণা পারাবতী সম্রাজ্ঞী যখন নিউকোচবিহার দেখতে চাইছে, ট্রেন পাস করানো হচ্ছে তখন, রাজধানী, পাস করাচ্ছে অন্যান্য ট্রেনের সঙ্গে মালগাড়িকেও। ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, পেরোলো কুঁতে কুঁতে, এইবার দাঁড়াচ্ছে কেন ওর জানা নেই। এসির টিকিট যেন মাঠেই মারা গেল। কো-প্যাসেঞ্জারদের বিরক্তি চোখে পড়ার মত। অস্বাভাবিক কিছু নয় এ ঘটনা বুঝতেই পারছে রাণী, ওরও একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। গুমানিহাটে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। দু' একজন হকার পসরা নিয়ে বেশ ব্যবসা করে নিচ্ছে এই সুযোগে। ক্ষিধের মুখে যে যার মত ঝালমুড়ি, বাদাম, ছোলামাখা সবই খেয়ে নিচ্ছে টুকটাক। করবে আর কী! সেই কখন শিয়ালদায় চেপেছে সন্ধে সাতটা পঁয়ত্রিশে... মনে মনে সময় হিসেব করে, কতটা সময় চলে গেল জীবন থেকে। বার বার এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, অন্যান্য ফাইল কভার গুছিয়ে দেখে নিয়েছে। বার কয়েক মন খারাপের উন্মত্ত বাতাসও বয়ে গেছে ওর সোনালি চুলের ফাঁক দিয়ে। পিএসসি ইন্টারভিয়ু যখন এল ও তখন টেকনো স্কুলে পড়াচ্ছে। রুবির কাছাকাছি বিড়লা গার্লসে। দু' কামরার ফ্ল্যাট নিয়েছে কতগুলো বছর... মাঝখানে পেরিয়ে গেছে পনের যোলো। সোহাগিনীকে নিজের কাছেই নিয়ে গিয়েছিল মেয়ে। রাজীবের চরম দুর্ঘটনার পর।

সেবার জুনের বন্ধে সম্রাজ্ঞী এসেছিল বাড়িতে। রাজীবের নাটকের দলও সেদিন বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ইন্সটিটিউট থেকে প্রথম পুরস্কার পেয়ে ফিরেছে, বাড়ি শুদ্ধু বেশ হই হই, উৎসব ঘিরে আছে সকলকে। সত্তরোর্ধ রাজীব তখনও ঋজু। শুধু মাঝে মধ্যে রাণীর জন্য মনখারাপের উঠোনে বসে থাকে। রবীন্দ্রসংগীত শোনে মাঝে মাঝে। নিজেও গেয়ে ওঠে দু কলি। সোহাগিনীও মোড়া পেতে বসেন মিষ্টি রোদে। হঠাৎই কুয়োর ধারের নারকেল গাছদুটো সহ ঠাকুর ঘরের অংশটা বিক্রি করে দিল মেজ ভাইয়ের ছেলে তন্ময়। একবার বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ বলে রাজীবকে শুধোল না পর্যন্ত। ওই যে মনের মধ্যে শূন্যতা, ওই যে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া চোখের উপর দেখতে দেখতে চুপচাপ হয়ে গেল সে। লেখার গতি নেই, রাজার শহরের উদ্দামতার দিনগুলোর স্মৃতিচারণ নেই, শহীদবেদীর বকুল বাদল বন্দনা সতীশদের গল্প গেল ফুরিয়ে... কেমন শুকিয়ে এল সব। তবু ফাঁকটুকুতে সম্রাজ্ঞী অক্সিজেন। কাজ ফেলে ছুটে আসা সেই রাণী, যে কিনা তলোয়ার দিয়ে যুঝবে সবার সব অসুবিধে, সব বিষাক্ত বাতাস, ছিঁড়ে দিতে পারবে সে। সোহাগিনীর ফোনে ছুটে এসেছিল সে। না, শেষ রক্ষা আর হল কোথায়! সম্রাজ্ঞী পারল না ঐ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া শরীরটাকে নিজের সমস্ত উৎসাহ আর উপবাসের মন্ত্র দিতে। রাতের অন্ধকারে চুপি চুপিই ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাকে চলে গেলেন বাবা। ঠিক একমাস।

রাজীব মিত্রের শ্রাদ্ধ শান্তির পর সবটা প্রায় দৌড়েই সেরে নিয়েছিল রাণী, তারপর মিত্র বাড়ির ছোট ভাইয়ের বরাদ্দ পিছনের অংশ মাটির সে দাওয়া দেওয়া একটি ঘর আর পরে নতুন করে বানানো কোঠা পাকা ঘর, টিনের চাল অদ্ভুত, সুন্দর সোহাগিনীর হাতে তৈরি বাগান সব অন্য কারও হাতে তুলে দিয়ে দুই নারী চোখের জল চাপা দিয়ে, বুকের অসংখ্য দাগ তোর্সার জলে বিসর্জন দিয়ে মহানগরীর দিকে পাড়ি দিয়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক। বাস্তব। মার যেতে ইচ্ছে নেই, সোহাগিনীর কঠিন মুখ আর রেখায় রাণী বুঝতে পারে, কিন্তু কী করবে! কীভাবে রেখে যাবে মানুষটাকে, অন্য এক মানুষের সারাজীবনের সুখ, আহ্লাদ, যাপনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখা মানুষ এমন খাঁ খাঁ করা সংসারে একা ঘুরে বেড়াবে কীসের সন্ধানে! পোপোনকে ফোন করে একদিনে তৎকালে টিকিট যোগাড় করে ফেলেছিল। এই পোপোন-ই ওদের টিকিট যোগাড়ে অগতির গতি। যেখানেই যাও পোপোন হাজির। সে রাণী কেন, রাজনগরের পরিচিত জন যে ক'জন আছে, আর রাণীর তো সে সম্পর্কে ভাইপো। সে-ই যে বন্ধু, আত্মীয়

আজ এতগুলো বছর পর সেই শহর... সেই নিজের কলেজে যোগ দিতে এসে প্রাণ আকুপাকু করবেই। না, সোহাগিনী আসতে চাননি। সম্রাজ্ঞীর ঘরদুয়ার নিজের মত সাজিয়ে নিয়েছে মা। কী যে সহায় তিনি ওই কলকাতা শহরে, রাণী ছাড়া আর কে জানে তা। না, হাজার বলেও সম্রাজ্ঞীকে বিয়েতে রাজি করাতে পারেননি সোহাগিনী, অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুরাও। ওর পাথর স্ফটিকের মত মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন বিয়ের কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন সোহাগিনী।

পরিজন... নাট্যদলের প্রিয় বন্ধুরা সবাই এসেছিল সেদিন নিউকোচবিহার স্টেশনে। ...সেদিন কিন্তু এমন সেজে ওঠেনি স্টেশন, স্টেশন চত্বর। সোহাগিনীও চোখের জল আটকে পাথর হয়েছিলেন একেবারে। রাণীর বুক ফেটে যাচ্ছে... আজ এতগুলো বছর পর সেই শহর... সেই নিজের কলেজে যোগ দিতে এসে প্রাণ আকুপাকু করবেই। না, সোহাগিনী আসতে চাননি। সম্রাজ্ঞীর ঘরদুয়ার নিজের মত সাজিয়ে নিয়েছে মা। কী যে সহায় তিনি ওই কলকাতা শহরে, রাণী ছাড়া আর কে জানে তা। না, হাজার বলেও সম্রাজ্ঞীকে বিয়েতে রাজি করাতে পারেননি সোহাগিনী, অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুরাও। ওর পাথর স্ফটিকের মত মুখের দিকে তাকিয়ে একদিন বিয়ের কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন সোহাগিনী।

সম্রাজ্ঞীর ট্রেন সময়ের চেয়ে তিনঘন্টা লেটে এসে পৌঁছল। কলেজ প্রিন্সিপালকে ফোন করে দিয়েছে আগেই সম্রাজ্ঞী, যেতে দেরি হবে যে! সেতো সিনিয়ার প্রফেসর পদে জয়েন করবে। কলকাতা শ্রী শিক্ষানিকেতন মহিলা কলেজ থেকে অন প্রমোশন আসছে। এখানকার রিসার্চ ফেলোদের গাইড করাও তার কাজ। স্টেশনে নামতেই টের পেল। সাদা ফিয়াট ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল। কলেজ আর্দালি স্বপনের সঙ্গে ওই দিনই মধুর সম্পর্ক তৈরি হল। কলেজ কোয়ার্টারে যখন পৌঁছল ভর দুপুর। সূর্য মাথার উপর। ...হলে কী হয়, শুধু স্নান গা ধোওয়া জম্পেশ করে, তারপর কলেজে জয়েনিং এর আপামর অফিশিয়াল কাজ কর্ম সেরে স্বপনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়া। ওর পিএইচডির বিষয়েও সুনীতি দেবী ঘুরে ফিরে এসেছেন। তাঁর বইগুলো তো সব বুকের ভিতর গোটানো পৃষ্ঠার মত। খুব মনে পড়ছে বাবার কথা। তোর্সার ধারের বাড়িটার দিকেই ছুটেছে প্রথমে। সেই চেনা ছবি চলচ্চিত্রের মত এপাশ ওপাশ ছোটাছুটি করে, সব কোথায় উধাও। সে নদীটাই নেই। সেই প্রিয় নদী... যার পাড়ে দাঁড়িয়ে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মা জেঠিমার কাসুন্দির সরষে নিয়ে গভীর জলে ডুব। সেই স্নানের ছবি। প্রিয় সে মুখের 'চিনি চিনি মধু মধু' ধ্বনি। ...রবার গাছের নীচে রাজীব মিত্রের দাঁড়িয়ে থাকা মেয়ের জন্য ...বুকের কষ্টের সঙ্গে কান্নারা দলা পাকিয়ে গলার কাছে এসে থামে। সব আটকে নিতে শিখে গেছে মধ্য চল্লিশের সম্রাজ্ঞী। কোথাও চেনা ছবি খুঁজে পায় না, মিত্র বাড়ির তোরণও নেই, নেই সে বাগানও। চেনা মুখ খোঁজে সে। ...কতগুলো মুখ মনে হয়, হ্যাঁ ...এই তো কে যেন... বুড়ি, ছোটবেলার পাশের বাড়ির বন্ধু, কিংবা ওই যে বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন, উনি কি মলয় কাকু! কে জানে, এই করে স্বপনের সঙ্গে তোর্সার বাঁধের উপর দিয়ে হয়ে ওঠা মসৃণ পাকা রাস্তা ধরে ঘুরপাক, তারপর সাগরদিঘির উত্তর পাশে নৃপেন্দ্রনারায়ণের সেই বলিষ্ঠ ঋজু শরীর মাথায় পাগড়ি সহ উজ্জ্বলতায় আজ ও দাঁড়িয়ে। সংস্কারে ছোঁয়া আছে সে প্রাচীনত্বের শরীরে। রাজবাড়িও সে প্রত্ন ভগ্নদশায় নেই, সেই প্রাচীন ইতিহাস পেরনো নতুন লাল রঙে রাজপ্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে একই ভাবে। উজ্জ্বলতা রাজবাড়ির সাজিয়ে তোলা স্টেডিয়ামেও। অন্যদিকে গেট দিয়ে টিকিট কেটে পর্যটকরা ঢুকছেন বেরোচ্ছেন। প্রাচীন কালের সেই অস্ত্র শস্ত্র, বিলিয়ার্ড বোর্ড, টেনিস কোর্ট, গলফখেলার সুন্দর সবুজ ঘাসের একটুকরো লন... সব সুন্দর করে রাখা। সেই সঙ্গে রাজবাড়ির ঝাড়বাতি সহ সে দরবার কক্ষটিও ঝক ঝক করছে। শুধু পুরনো এক ঝাঁক টিয়ে এখনও খিলানে উঁচু কোটরে বাসা বেঁধে আছে...ওড়াউড়ি চলছে বেদম।

সম্রাজ্ঞী ঘুরে ঘুরে নিজের বুকের যন্ত্রণার সঙ্গে কার যন্ত্রণার শব্দ শোনে। ব্রাহ্ম মন্দির উপাসনাঘর ছেড়ে পিভিএন এন রোডে যখন বিরাট সবুজ তোরণের সামনে এসে দাঁড়ায় সে আধভেজানো সে লোহার দরজা ঠেলতেই ফাঁক হয়। পাশের ছোট গেটখানা অকেজো। দারোয়ানের ঘরটাও। ঢুকতেই থমকে দাঁড়ায় সে। ওই তো সাদা পোষাক, মাথায় শিরস্ত্রাণের সঙ্গে সাদা উড়নী...আবক্ষ মূর্তি মহারানী সুনীতির আজন্মকালের সেই নিত্য সঙ্গী স্বপ্নে জাগরণে, তখন সূর্য ঢলে গেছে, সূর্যের একফালি আলতো লালচে রঙ এসে পড়েছে তাঁর মুখে। —বাঃ অপূর্ব ভাস্কর্য... স্বপন, কে তৈরি করেছে জানো তুমি?

—না ম্যাডাম, তবে আমি তো বরাবরই দেখছি।

—হুঁ, আসলে আমরা যখন পড়েছি তখন এ মূর্তি এখানে স্থাপিত হয়নি।

—হ্যাঁ ম্যাডাম, এ মূর্তি সার্ধশতবর্ষের সময় তৈরি হয়েছিল। ...এখন আর ভিতরে যাওয়া বোধহয় ঠিক নয়। সন্ধে পেরিয়ে গেছে। সকালে এসে কোনওদিন ঘুরে দেখে যাবেন। ...বাঃ! ভেপার ল্যাম্পগুলো বেশ জ্বলছে কিন্তু। স্কুলটাকে ঘিরে আছে, মহারাণীর মুখও উজ্জ্বল, সমস্ত স্কুলকে যেন ঘিরে রেখেছেন প্রতিষ্ঠাত্রী। জননী। অলক্ষেই দু' চোখ বুজে আসে সম্রাজ্ঞীর। প্রণাম করে আদি জননীকে।

স্বপন অবাক চোখে তাকায় সম্রাজ্ঞীর দিকে। মনে মনে ভাবে রাণী, আহা! আমার কলেজখানাই তো দু'চোখ ভরে এখনও দেখা হল না, রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করবে, তারপর সোহাগিনীকে কত কথা যে জানাবে... সবটা জমে আছে গল্পের মত বুকের মাঝ বরাবর।

১৭

কলেজের আলোময় চৌহদ্দি ভারী সুন্দর, আর ব্যালকনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই রাত আটটায় চারদিকে গাড়ি, রিক্সা, অটো চালনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজেন্দ্রশীলের আলোকিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকে রাণী। একটু আগেই সোহাগিনীর সঙ্গে কত কথা হয়েছে তার। উমা নামের সেই আদরের ছাত্রীকে সম্রাজ্ঞী নিজের মেয়ের মতই ভালবাসে। ওকে নিজের কাছে রেখেই পাশ করিয়েছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে শুধু না, অনেকেই জানে ও সিঙ্গল মাদার। ঠিকই তো। কত্ত ছোট শিশু তখন, আর এখন! সদ্য কলেজে পা। বাসন্তীতে ভর্তি করেছে। আর মার সঙ্গে ওকে রেখে আসায় মনের মধ্যে এক প্রশান্তিও কাজ করছে।

কত টুকরো টুকরো চিঠির কথা মনে পড়ছে, যে চিঠিগুলোয় রাজনগরের মহারাণীর কথা, তাঁর ইচ্ছের কথা, ভালবাসার কথা আর মানুষের উপর নিবিড় টানের কথা ইতিহাস হয়ে আছে। এই রাজমাতা বিদূষী, সুসাহিত্যিক, এই সমাজ সেবিকার আন্তরিক চেষ্টার ফলেই তো ঊনিশ শতকের স্ত্রী শিক্ষার আন্দোলন ব্যাপক আর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এই সুদূর কোচবিহার রাজ্যে। স্ত্রী শিক্ষা শুরু হল তাঁর অদম্য উৎসাহে নারী শিক্ষার হার তাঁর উৎসাহেই ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল সে সময়... তাহলে মহারাণী সুনীতিদেবীকেও এত কষ্টে কেন কাটাতে হল বাকি দিনগুলো... জীবনের শেষদিনগুলো কি তাহলে এমনই হয়ে ওঠে! একা থাকা ইচ্ছের রাণী আজ কেন একথা ভাবছে! এই কলেজ চত্বরে ফিরে এসেছে বলে!

উমাকে খুব ভাবছে রাণী, খেয়েছে তো ঠিক ঠাক... মা-ই বা কী করছে এখন।

সেই সনাতন নারী ভাবনা, মহারাণীও ঠিক তাই। শুধু কোচবিহার কেন, দার্জিলিঙেও সুনীতি দেবী তৈরি করেছিলেন স্কুল, কলকাতাতে ছড়িয়ে আছে তাঁর সৃষ্টি আর গড়ে তোলার ইতিহাস। ...কেশবচন্দ্রের শিক্ষায় উন্নতমনা নারী আজ দাঁড়িয়ে আছেন সম্রাজ্ঞীর সামনে...

সুনীতির নাম আরও শীর্ষে, কোচবিহার তথা বাংলা তথা ভারত ছাড়িয়েও আরও কেন মানুষের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নিল না, পাঠ্য কাহিনিতে তাঁর জীবনী কেন বিষয় হয়ে উঠল না আজও সে কি সুনীতি নারী বলে, পুরুষ শাসিত সমাজের ইচ্ছের খেয়ালে কি তাঁকে একটুখানি অন্তরালেই থাকতে হল! কেন যেন বুকের ভিতর প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, ইচ্ছে করে মানুষটার মুখোমুখি হতে।

স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের যে চেষ্টা কেশবচন্দ্র শুরু করেছিলেন তা মহারানী সুনীতিদেবীর হাতে কলকাতা ছাড়িয়ে সুদূর উত্তরবঙ্গের প্রান্তে অবস্থিত প্রথাগত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন ও অন্তর্মুখী পর্দানসীন কোচবিহার রাজ্যের মহিলা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল, রাণী, মা, ঠাকুমা সবাই তো সে শিক্ষা পেয়েছেন যে স্বপ্ন কেশবচন্দ্র দেখেছিলেন তারই বাস্তবায়ণ ঘটিয়েছেন সুনীতিদেবী, তাহলে মূল ইতিহাসের রাজনগরের এ মহারাণীর অসামান্য উপস্থিতি ইতিহাসে নতুন হয়ে আসুক, ছোটদের পাঠ্যজীবনীতে তিনি আসুন... কেমন অস্থিরতা টের পায় সম্রাজ্ঞী। কোচবিহার কেন, পাশের শহরগুলোর মুষ্টিমেয় মানুষ ছাড়া ক'জন জানে তাঁর কথা! খুব যন্ত্রণা হয় সম্রাজ্ঞীর। থিসিস পেপারের ইংরেজি অনুবাদ খুব শীঘ্রি তৈরি করে ফেলবে মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। বারান্দায় পায়চারি করে। বই আকারে কীভাবে শুরু করবে ভাবতে থাকে। ঠিক তখনই সুনীতিদেবীর ছেলে জিতেন্দ্রনারায়ণের চিঠির কয়েকছত্র মনে পড়ে যায় রাণীর। এত কিছুর মধ্যেও... এই যে ল্যান্সডাউন হলে কলকাতার কমলকুটিরের মত আনন্দমেলার আয়োজন, মেয়েদের হাতে কলমে শিক্ষিত আর তা থেকে উপার্জনক্ষম করে তোলার যে সাহস তিনি যুগিয়েছেন তা এই নতুন পৃথিবীকে পথ দেখায় বার বার। বিশেষত নারী সমাজকে। তাই বলে কি তিনি পরিবার সামলে চলেন নি? নিশ্চয়ই। এখানেই তো তাঁর আদর্শ সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। শুধু কি নিজের সন্তান! সুনীতিদেবীর আত্মচরিত এবার জনসমক্ষে অন্য ভাবে তুলে ধরার সময় এসেছে।

সম্রাজ্ঞী মনে মনে সে দিনটির স্বপ্ন দেখে যেদিন মানুষ, নারী সমাজ ২৯শে সেপ্টেম্বর দিনটিকে পালন করবে বিশেষদিন বলে। যেদিন পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন সুনীতি। নিজেই আত্মচরিতে বলেছেন, কোচবিহারের জনগণ তাঁকে একজন আদর্শ রমণী ও মা বলে মনে করতেন। ব্রাহ্মসমাজের মুক্ত আবহাওয়ায় বাস করলেও রক্ষণশীল রাজ পরিবারকে যেমন মানিয়ে নিয়েছিলেন, তেমনি প্রবেশ করিয়েছিলেন বিশুদ্ধ বাতাস। পর্দা প্রথার বাইরে গিয়েছিলেন তিনি নিজে, কিন্তু যারা পালন করতেন তাদের বিরুদ্ধে যান নি। এখানেই তো তাঁর মহত্ব।

এই রাতে খুব উমাকে মনে পড়ছে রানীর। মায়ের স্নেহ, দিদিমার লালন সবটুকু দিতে চেয়েছে উমাকে সম্রাজ্ঞী। শত কাজের মধ্যেও ওকে একবার ফোন কিংবা ওর ঘুটিয়ার শরিফের বাড়িতে একবার করে সপ্তাহান্তে দেখা করিয়ে আনা সবই করেছে রাণী। আর পরেরদিকে উমা ওর বাড়ির পরিবেশ কিংবা মানুষজনের অজস্র কৌতূহলে আর যেতে চায় নি। তবু মাঝে মাঝে সে দরিদ্র পরিবারে কিছু অর্থ তুলে দিয়েছে রাণী। ধীরে ধীরে যোগাযোগ ওরাই আর রাখেনি। এতগুলো মুখ সংসারে। কী করে খোঁজ রাখবে! উমাকে খুঁজে পেয়েছিল সেই প্রথমদিকে যে স্কুলে ও পড়াত সেই স্কুলের দারোয়ান লক্ষ্মীরামের কল্যাণে। মা মরা সন্তান... গ্রাম থেকে তুলে এনেছিল লক্ষ্মী। পরে নিজেই অতটুকু শিশুর দেখাশোনা করতে পারছিল না। বড় স্নেহকাড়া মেয়ে উমা। সম্রাজ্ঞীর একাকীত্বে বুভুক্ষু মনের ভিতর কী করে ঢুকে গেল মেয়েটা, এখন আর পিছন ফিরে দেখতে চায় না সম্রাজ্ঞী। সত্যিই অদ্ভুত মেয়ে উমা। মেধাবী। অভিভাবক হয়ে উঠেছে মুহূর্তে। প্রতিমুহূর্তে উমার ভাবনা ভরিয়ে রাখে ওকে। মনে মনে বলে কে বলেছে ইচ্ছে হলে মা হওয়া যায় না! সোহাগিনীকেও বোঝাতে পেরেছে রাণী। তিনিও বুকে টেনেছেন মেয়েটাকে। আর এখন উমাই সোহাগিনীর যষ্টি।

ঘড়িতে রাত দেড়টা ছাড়িয়েছে। কাল সকালের ক্লাসটা ওর প্রথম ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মোলাকাতের দিন। শুয়ে পড়তে হবে। প্রতি রাতের আকাশে তারার ছবি দেখা, কল্পনায় ডুবে যাওয়া ওর ছোটবেলার স্বভাব। রাজীব যেমন চিনিয়েছে রাণীকে রাণীও উমাকে। উমা এখন সোহাগিনীকে ধ্রুবতারা চেনায়। আড়াল থেকে রাণী দেখে। আজও সেই আগের মত আকাশ দেখে রাণী। সন্ধের দেখা আবক্ষমূর্তির কথা মনে হয়। মনে মনে ঈশ্বর মানে তাঁকে। এবার শুতে যাবে। দোতলার বারান্দার দিকের ব্যালকনির দিকের দরজাটা বন্ধ করতে ইচ্ছে হয় না। ঘর থেকে ধ্রুবতারার উজ্জ্বল আলো ঠিকরে আসছে যেন। ঘরের বাতিটা আর জ্বলে না, শুয়ে পড়ে রাণী, কর্মমুখর এক সকালের প্রতীক্ষায়।

* * *

না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ...
ওরে জাগিয়া উঠিছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠিছে বারি, ওরে প্রাণের আবেগ, প্রাণের বাসনা রুধিয়া রাখিতে নারি...

রাজ পরিবারের মধ্যে সাহিত্য সাধনার নব জাগরণের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের বাণীর উদ্গাতা মহারানী। ঠাকুর পরিবারের জ্ঞানদানন্দিনী যেমন নারীর পোষাকে শাড়ি পরায় নতুনত্বে চমকে দিয়েছিলেন, সুনীতিদেবী কম কি? তিনিও এ প্রান্ত শহরে পোশাকে এনেছিলেন আধুনিক ধরন। নতুন রীতির শাড়ি পরার রীতি এ প্রান্তিক রাজ্যেই তিনিই প্রচলন করলেন।

একদিকে আধুনিক শিক্ষা, বিলেত ভ্রমণ অন্যদিকে নারীদের নীতি শিক্ষায় বিশ্বাসী করে তোলা এই দুই সত্ত্বা, বোধ বা বিশ্বাসের মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কাছে নারীর আদর্শ সেবাপরায়ণতা। সতি সাধ্বী নারীর জীবন ও ছবি তাঁর আদর্শ ছিল ঠিকই, কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি কখনও। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পিতা ও স্বামীর ছত্রছায়ায় নানা রক্ষণশীলতায় থেকেও সেই সময়ের নিরিখে তাঁর আধুনিকত্ব দৃষ্টান্ত দাবি করে।

একালের সম্রাজ্ঞী সে রক্ষণশীলতার বাধা গত কবেই কেটে বেরিয়েছে, কিন্তু পদে পদে অন্যায়কে তো রুখতেই হবে, আজ প্রথম ক্লাসে গিয়ে শিহরণ জেগেছিল সম্রাজ্ঞীর। সেই ক্লাস, যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো সময়, পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনা, রিহার্সাল কতভাবে কেটে গেছে। মনে পড়ছে মহারাণীকে নিয়ে প্রথম কচি হাতে সেমিনার সাজিয়ে তোলা। অরুণের সঙ্গে চায়ের দোকানে জমায়েত।

ইতিহাসে সমাজ আর সাহিত্য তুলে এনে আজকের ক্লাসে দশজন ফেলো ছিল। সকলেই মত বিনিময় করেছে, মতামত দিয়েছে। সম্রাজ্ঞী খুশি। ওর বইয়ের কাজও দ্রুতই হবে মনে হচ্ছে। একঘণ্টা অফ। তারপর থার্ড ইয়ারের ক্লাসে যেতে হবে। আর তারপরই বেরিয়ে যাবে সম্রাজ্ঞী। বেশ চনমনে লাগছে। স্বপন হোম ডেলিভারি ঠিক করে দিয়েছে। রান্না খুব খারাপ না, ছ'মাস কেটে যাবে। বেশি দেরি হলে বছর খানেক, তারপর কলকাতা। উমাকে দেখাবে রাজনগর। এ ছুটিতে সোহাগিনী আর উমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। একটু আগেই উমা ফোন করেছিল, 'দিদা খাচ্ছে না দেখ, একটু স্যুপ আমাকে দিয়েছে, নিজে কিন্তু খাচ্ছে না মাম, তুমি বল।'

—বেশ বেশ। মা, তুমি খাচ্ছো না কেন!..

এই বেশ কথায় কথায় মনে হয় তিন নারী যেন একসঙ্গেই আছে। ...একই ছাদের নীচে। ...এক রাজ্যে জয়ের ইতিহাস তৈরি করবে সম্রাজ্ঞী। অন্যরকম, রাজীবের ভাবনার রাজ্য। সেখানে সুনীতির শেষজীবনের দুঃখ থাকবে না। কষ্টেও সঙ্গে থাকবে মানুষ বহু মানুষের হাতের স্পর্শ। ভালবাসার মানুষেরা যাদের প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন তিনি। নির্জনে একা বিভুঁইয়ে...

ভাবতেই মহারাণীর রোগজীর্ণ শীর্ণ হয়ে ওঠা শরীর দেখতে পায় যা রাণী দেখতে চায় না। মন কেমন করে। চারপুত্র তিনকন্যার জননী হওয়া সত্ত্বেও এমন একাকী মরতে হল কেন!!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

যে শরীর ডাউনলোড হয়

অরণ্য মিত্র

তিনবন্ধু। ঋতম, বিনায়ক, হিমেশ। ঋতমের গার্ল ফ্রেন্ড ব্যালেরিনা। ঋতম তাঁকে দুই বন্ধুর সাহায্যে খুন করায়। দিন কাটে। নয়না রবাবী বলে একজন একটা সেক্স গেম-এর ডেমোনেস্ট্রেশন দিতে ময়নাগুড়িতে ঋতমের বাড়ি আসে। সে গেম খেলোয়ারের শরীরে যৌনতৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে আসে। ঋতম ভেবেছিল এসব কোম্পানির প্রচারমাত্র। অথচ বাস্তবে তাইই হয়। বিনায়কেরও তাই ধারণা। কিন্তু এক রাতে গেমটা খেলার সময় বিনায়ক খুব ভয় পেল। ঋতম তাঁকে ফোনে উৎসাহ দিয়ে বলল, গাঁজা খেলে মানুষ অনেক কিছু দেখে। তারপর?

৫

সেক্স গেম এমন সাঙ্ঘাতিক হতে পারে হিমেশ কল্পনাও করে নি। পরশু নয়না রবাবী ডেমো দিয়ে গিয়েছিল। গেম হাতে এসেছিল তার ঘণ্টা দুয়েকর পর। সেই থেকে পুরো মজে আছে হিমেশ। গেমের সব চাইতে উপভোগ্য দিকটা হল যে এটা খেলতে খেলতে শরীরে উত্তেজনা জন্মায়। ক্রমশ সে উত্তেজনা পৌঁছয় চরমে। প্রতিটা স্টেজ শেষ করার মুহূর্তে ক্লাইম্যাক্সের অনুভূতি জাগে। প্রথমবার তো হিমেশের মনে হয়েছিল তাঁর পতন হয়ে গেছে। সেটা অবশ্য অনুভবই ছিল। কিন্তু এটা কীভাবে হয় তা হিমেশ জানে না।

আজ ব্যবসার ঝক্কি ঝামেলা সামলাবার পর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরতে হিমেশের দেরি হয়ে গেছে। এখন রাত প্রায় বারোটা। রাস্তায় রুটি মাংস খেয়েছিল ঘণ্টা দুয়েক আগে। রাতে খিদে পেলে দেখা যাবে। আসলে হিমেশকে টানছিল গেমটা। দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে ল্যাপটপটা খুলে বসল সে বেড রুমের বিছানায়। তাঁর ল্যাপটপটা বেশ শক্তিশালী। কিন্তু নয়না রবাবী বলেছে, দশ নম্বর স্টেজের পর আরও পাওয়ারফুল ডিভাইজ লাগবে। সে ক্ষেত্রে হিমেশ ঠিক করে ফেলেছে একটা ডেস্ক টপ নেবে। বড় মনিটর আর ভাল সাউন্ড সিস্টেমে গেমটা যে আরও সেক্সি হবে, তা নিয়ে হিমেশের কোনও সন্দেহ নেই।

গেম চালু করতেই হিমেল একটা বার্তা পেল। তিনটে স্টেজ পার করার জন্য তাঁকে একটি উপহার দেওয়া হচ্ছে।

বার্তার নিচে 'ডাউনলোড' লেখা বাটনে ক্লিক করতেই কালো হয়ে গেল স্ক্রিনটা। সাদা হরফে ফুটে উঠল দুটি বাক্য— 'ইউ আর গোয়িং টু ডাউনলোড আ ফ্রেশ ফিমেল ফ্রম কোয়ান্টাম টু রিয়াল। প্রেস এন্টার ইফ ডেয়ার টু কন্টিনিউ'।

হিমেশ মনে মনে হাসল। এমন প্রস্তাবে না বলার কোনও মানেই হয় না। এন্টার বাটনে তর্জনি দিয়ে আলতো চাপ দিয়ে টান টান হয়ে বসল সে। স্ক্রিনটা একটই রকম থাকল, কেবল বাক্যদুটো মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল একটা লম্বাটে চৌকো খোপ। দু' ইঞ্চি লম্বা সে খোপ একটু একটু করে ভরতে শুরু করল হলুদ রঙে।

'ইট উইল টেক সেভারেল মিনিটস টু কমপ্লিট'

খোপের নিচে লেখাটা ফুটে উঠতেই হিমেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা থেকে নামল। ফ্রিজে বিয়ার আছে। মদের প্রতি হিমেশের খুব একটা আসক্তি নেই। কাজ থেকে ফিরে একটা-দুটো বিয়ার নেয় কোনও কোনও দিন। ডাউনলোডের ফাঁকে এক গেলাস বিয়ার খাবে ভেবে সে বেড রুম থেকে বেরিয়ে এল। গেলাসে বিয়ার ঢেলে ব্যালকনির দরজাটা খুলে দিয়ে বিনায়ককে ফোন করল। ঘরের ভেতর একটু গরম লাগলেও বাইরেটা বেশ ঠান্ডা। ব্যালকনিতে এসে সে শুনতে পেল বিনায়কের গলা—

'বল।'

'আর কোনও শব্দ টব্দ শুনিস নি তো?'

'ধুর্বাল!' বিনায়কের হাসি শোনা গেল। 'দ্যাট ফাকিং সাউন্ড ওয়াজ মাই ইলিউশান। ঋতম ঠিকই বলেছিল।'

'এন্ড দ্যা সিগারেট? সেটা কি অ্যাশট্রেতে তুইই ফেলে গিয়েছিলি?'

'ঋতমকে বলিনি, বাট ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং— আমি মাঝখানে দু-চার দিন মারিজুয়ানা স্মোক করেছিলাম।'

'ওই জন্যই।' হিমেশ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সহানুভূতির গলায় বলল। 'ডোন্ট টেক মারিজুয়ানা ইয়ার। ইটস্ হ্যালুসিনেটিভ।'

'সরি।'

'লিভ ইট। গেমটা কেমন খেলছিস?'

'আনবিলিভেবেল্ ইয়ার!'

'ক'টা স্টেজ হল?'

'এক নাম্বারেই আছি বস্!' বিনায়কের উচ্ছ্বসিত গলা শুনল হিমেশ। 'পরের স্টেজ ট্রাই করি নি।'

'আই ক্রসড্ দ্য থার্ড লাস্ট নাইট এন্ড গট আ রিওয়ার্ড।'

'হোয়াটস্ দ্যাট?'

'ডাউনলোড হচ্ছে। আ ফ্রেশ ফিমেল ফ্রম কোয়ান্টাম টু রিয়াল।'

'ইন্টারেস্টিং! কী হল আমাকে জানাস তো? বাই দা ওয়ে, গেমটা খেলার সময় কি তোর সেক্স বেড়ে যায়?'

'ইয়েস স্যার! ফিলিং লাইক অ্যাজ ইফ আই অ্যাম কামিং! তোর হয় না?'

'সেম ফিলিং ইয়ার! আই জাস্ট ক্রসড্ দ্য স্টেজ এগেইন। স্যাটিসফায়েড্!'

'দেন লেট মি প্লে। গুড নাইট।'

বিয়ারের গেলাস ফাঁকা করে হিমেশ বেড রুমে এল। ডাউনলোড নিরানব্বই পার্সেন্ট হয়ে গেছে। চোঙাকৃতি শেপটা প্রায় ভরে গেছে হলুদ রঙে। হিমেশ বেশ কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল। মিনিট খানেক পরে স্ক্রিনটা ফিরে গেল পরিচিত ডেস্কটপে। ল্যাপটপের স্পিকারে বেজে উঠল একটি ফিসফিসে মহিলা কণ্ঠ—

'ডাউনলোড কমপ্লিট।'

হিমেশ গেমটা চালু করল। কী ডাউনলোড হল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সে যেটা টের পাচ্ছে সেটা হল একটা সুগন্ধ। হালকা কিন্তু মিষ্টি একটা গন্ধ। গন্ধের উৎসটা এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে পেল না সে। নাক টানতে টানতে খানিকক্ষণ ঘরের কোণাগুলো পরীক্ষা করে রুমের দরজা ঠেলে বের হতে গিয়ে থমকে গেল প্রচণ্ড বিস্ময়ে। কয়েক সেকেন্ড কোনও কথাই বলতে পারল না।

সেটাই স্বাভাবিক। বিরাট ডাইনিং স্পেসের শেষপ্রান্তে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নারী। সম্পূর্ণ নগ্ন। সেই অসামান্য লাবণ্যমন্ডিত শরীর যে কোনও পুরুষকে টলিয়ে দিতে পারে। হিমেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকল সেই নারীর দিকে।

'জাস্ট ডাউনলোডেড স্যার।' মেয়েটির শরীরে আন্দোলন দেখা গেল। সে এগিয়ে আসছে।

'আই উইল এক্‌জিস্ট ফর নেক্সট টু আওয়ারস স্যার। ইউ মে আনইনস্টল মি বিফোর দ্যাট।'

'হাউ ইজ ইট পসিবল্?' একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলল হিমেশ।

'ইট ইজ টপ মোস্ট ভার্চুয়াল রিয়ালিটি স্যার! ইউ জাস্ট টাচ মি। আই অ্যাম সো রিয়াল টু বী ফাক্ড্।'

পিছিয়ে যেতে যেতে বেড রুমে ঢুকে পড়েছিল হিমেশ। পেছনেই বিছানা। অলৌকিক নারী শরীর আচমকা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল হিমেশের ওপর। জলজ্যান্ত নারী শরীরের তাপ আর ভার টের পেল সে। সেই নারী মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে উন্মাদ করে ফেলল। হিমেশের গুলিয়ে গেল সব কিছু। উদগ্র কাম তাঁকে বিহ্বল করে দিচ্ছে। সে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে অসহনীয় সুখের দাপটে।

চূড়ান্তক্ষণের ঠিক আগে হিমেশ একটা দানবের মত সেই নারীকে পিষে ফেলছিল। চুলের মুঠি ধরে মুখটাকে নিজের বুকের মধ্যে মিশিয়ে দিতে চাইছিল সে। কিন্তু পারল না। নিদারুণ ভয়ে সে ছিটকে এল বিছানার এক প্রান্তে। তাঁর হৃদপিন্ড ফেটে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

বিছানায় শুয়ে আছে নগ্ন ব্যালেরিনা গুরুং।

একটা জান্তব চিৎকার করে চোখ সরিয়ে নিয়েছিল হিমেশ। চোখ খুলে দেখল কেউ নেই। সে একা বিছানার কোণায় নগ্ন শরীরে দরদর করে কেবল ঘামছে।

৬

আতঙ্কের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে হিমেশ কোনওক্রমে জামাপ্যান্ট পরে মানিব্যাগ আর ফোন নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পরে কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। শেষে নৌকাঘাট মোড়ের কাছে এসে প্রশস্ত রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ জোরে জোরে শ্বাস নেয়। জল খায়। তারপর গাড়ি থেকে নেমে পকেট থেকে মোবাইল বের করে নয়না রবাবীর নম্বর খোঁজে। রাত প্রায় তিনটে বাজতে চলল। নয়না রবাবী অবশ্য বলেছিল যে তাঁকে যখন তখন ফোন করা যায়। তবুও এত রাতে ফোন করা উচিত কি না ভাবতে গিয়ে একটু থমকাল হিমেশ। পরক্ষণেই ব্যালেরিনা গুরুং-এর শুয়ে থাকার ছবিটা মনে হতেই বুড়ো আঙুলটা নিজে থেকেই চলে গেল ডায়াল বাটনে।

'আমি নয়না রবাবী। বলুন স্যার, কী করতে পারি?'

নয়নার সতেজ গলা শুনে মনে হল না সে ঘুমোচ্ছিল।

'গেমটা থার্ড স্টেজের পর একটা ডাউনলোড অপশন দিয়েছিল? ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন হোয়াট দ্য হেল আই ফেসড্?'

'আমি আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি স্যার?'

'কী বুঝতে পারছেন আপনি?' হিমেশ ধমকের সুরে বলল। 'আই ওয়জ ফাকিং আ গার্ল হু'স ডেড্! ইজ ইট ইলিউশান? ইউ জাস্ট টেল ইট ওয়জ্ সো!

'পুরোটাই ইলিউশান স্যার। প্রথমবার এই সমস্যাটা অনেক কাস্টমারের হয়। সাবকন্সাসে যে থাকে সে চলে আসে। নেক্সট টাইম আপনি জাস্ট রিল্যাক্সলি রিঅ্যাক্ট করবেন স্যার। ইমেজ উইল বী কাস্টমাইজড্। বাট, জিনিসটা কেমন স্যার?'

'আনবিলিভেবল্। আই ডোন্নো হাউ ডিড্ ইউ ডু দিস! বাট আজকে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছিলাম।'

'আপনি সাবকন্সাস কাকে কাস্টমাইজ করেছিল স্যার?'

'দিস ইজ পার্সোনাল।'

'সরি স্যার। বাট ইউ মেনশানড হার ডেথ।'

'এ ব্যাপারে আপনাদের কোনও সার্ভে আছে?'

'আপনাকে স্যার ইন ডিটেইল বলতে হবে। ডাউনলোড হওয়ার পর থেকে বলুন।'

'আই স্মেইলড্ সামথিং গুড। যেন একটা পারফিউম—।

'ইন দ্য টাইম অফ জেনারেশন গন্ধটা পাওয়া যায়। নর্মাল। প্লিজ প্রসিড।'

'আমি বেড রুম থেকে বের হতে যাব তখন দেখলাম। শি ওয়াজ কমপ্লিট আউট অফ ওয়্যার।'

'হাউ ওয়াজ ইওর ফিলিংস?'

'তখনও আমি ভয় পাই নি। বাট গট টু পারপ্লেক্সড টু স্পিক।'

'ওকে।'

'আমি এমন মেয়ে কখনও দেখিনি। শি ওয়াজ পারফেক্ট— অ্যান্ড, অ্যান্ড শি গট মী শেমলেসলি—।'

'এভরিথিং ওয়াজ একর্ডিং টু প্রোগ্রাম স্যার। আপনি ভয় পেলেন কখন?'

'জাস্ট বিফোর কামিং আউট।'

'দিস ইজ পিকিউলিয়ার স্যার। অর্গাজমের ঠিক আগের সেকেন্ডে ভয় পাওয়াটা ঠিক ন্যাচারাল নয়।'

'দেন হোয়াটস্ ইওর অ্যাডভাইজ?'

'নেক্সট টাইম মেক দ্য ডাউনলোড ইন ডে টাইম। নিজেকে তাঁর আগে জাস্ট এনজয়মেন্টের জন্য রেডি করবেন স্যার। জাস্ট মনে রাখবেন অনেক কাস্টমার ডাউনলোড করে রেগুলার এনজয় করছেন অ্যান্ড দে আর ইন এস্টাসি। একটু মনের জোর নিয়ে খেলুন স্যার। ডেয়ারিং হওয়াটা এসেন্সিয়াল।'

'থ্যাঙ্কিউ!'

ফোনটা রাখতে গিয়ে একটু চমকাল হিমেশ। নয়না রবাবীর সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে তার ফোনে বার বার এসেছে বিনায়কের কল। সঙ্গে সঙ্গে রিং করল সে। তারপরেই শুনল বিনায়কের ধরা ধরা গলা, 'তুই কোথায়?'

'তুই কোথায়?' পাল্টা জিগ্যেস করল হিমেশ। 'তোর কিছু হয়েছে?'

'তোর ফ্ল্যাটের সামনে। সিকিওরিটি বলল তুই বেরিয়েছিস একটু আগে।'

'কী হয়েছে বিনায়ক?' হিমেশ গাড়িতে বসল। 'তুই ওয়েট কর আমি আসছি।'

'সাম মাদার ফাকার এক্‌জিস্টস্ ইন মাই ফ্ল্যাট এন্ড স্মোকিং—।'

'মারিজুয়ানা লাস্টস্ ফিফ্‌টিন ডেজ ইন ব্লাড।'

ফাঁকা রাস্তায় হু হু গাড়ি ছোটাল হিমেশ। নয়না রবাবী ঠিকই বলেছে। সাহসী হওয়াটা জরুরি। হাওয়া থেকে একটা জ্যান্ত, টগবগে, তন্বী নেমে এসে মিলনের আহ্বান জানাচ্ছে— কীভাবে হচ্ছে, সেটা জানার দরকার নেই। জাস্ট গো এন্ড ডু। এটাই আজকের পৃথিবী। বিছানায় কে জানা জরুরি নয়। ব্যালেরিনা গুরুং একটা দুর্বলতা। আর এটা হিমেশ নিজের কাছে জোর গলায় স্বীকার করবে যে গত কয়েক দিন ব্যালেরিনা গুরুং-এর কথা সে অন্ততঃ তিন-চার বার ভেবেছে। কেন ভেবেছে সে জানে না। কিন্তু এসব নিয়ে বেশি ভাবার কোনও অবকাশ নেই।

ফ্ল্যাট বাড়ির ঠিক সামনে সিগারেট টানছিল বিনায়ক। রাত পোশাকেই বেরিয়ে এসেছে সে। চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। হিমেশের গাড়িকে আসতে দেখে সে দৌড়ে এল।

'সাম ফাকিং থিং ইন মাই ফ্ল্যাট ইয়ার!' গাড়ির জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিনায়ক। হিমেশ দরজা খুলে তাঁকে পাশে বসাল। এসি চলছিল। বিনায়ক আরাম পেল খানিকটা। দু-হাতের তালু দিয়ে মুখটা একবার ঘসে নিয়ে একটা শ্বাস ছাড়ল ফোঁস করে।

'হোয়াটস হ্যাপেন্ড বিনায়ক?'

'একদম আগের দিনের মত।' বিনায়ক ক্লান্ত স্বরে বলল। 'গেমটা খেলার পর আমি বেডরুমে চলে যাই। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলতে পারিস। সাডেনলি আই হার্ড আ সাউন্ড অ্যান্ড কেম আউট। দেখি ডাইনিং টেবিলে একটা সিগারেট অ্যাসট্রেতে রাখা। সেটা জ্বলছিল। মানে জাস্ট কেউ ধরিয়েছে।'

'ওকে।' হিমেশ গাড়িটা গ্যারাজের দিকে নিয়ে যেতে যেতে শান্ত গলায় বলল। 'আগে আমরা ঘরে যাই। দেন আই'ল এক্সপ্লেইন।'

'দারু আছে তোর রুমে?'

'বিয়ার আছে।'

'নট ব্যাড।'

মিনিট পনের পর নিজের ফ্ল্যাটে বিনায়কের দিকে একটা বিয়ারের বোতল এগিয়ে দিয়ে হিমেশ তাঁর মুখোমুখি বসল। বিনায়ককে এখন বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। আধ বোতলের মত ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দুটো ঢেকুর তুলল সে।

'লিস্‌ন টু মি বিনায়ক!' গেলাসে খানিকটা বিয়ার ঢেলে নিয়ে চুমক দিয়ে বলতে শুরু করল হিমেশ। 'অ্যাকচুয়ালি নাথিং ওয়জ হ্যাপেন্ড— কিচ্ছু ঘটে নি। গেমটা রেগুলার খেললে এই ধরনের ইল্যুশন খুব নর্মাল। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু বী ডেয়ারিং এনাফ।'

'কী বলছিস তুই?' কিঞ্চিৎ ঘড়ঘড়ে শোনায় বিনায়কের গলা। 'সাউন্ডের ব্যাপারটা ছেড়ে দে। বাট দ্য সিগারেট?'

'তুই ছেড়ে এসেছিলি। দেন ইউ ফরগট দ্য হোল।'

'বেডরুমে আমি এট লিস্ট হাফ এন আওয়ার ছিলাম ইয়ার! সিগারেট জ্বালিয়ে ভুলে গেলে সেটার চেহারা অন্যরকম হত।'

'হয়ত তুই পাঁচ মিনিটও ছিলি না বেডরুমে। বাট তোর মনে হয়েছে হাফ এন আওয়ার।' শান্ত গলাতেই বলছিল হিমেশ। গেলাসে আরও একটা চুমুক দিয়ে বিনায়কের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু।

'হোয়াই আর ইউ স্মাইলিং? আমাকে তোর পাগল মনে হচ্ছে?'

'তোর ডেয়ারিং হওয়া দরকার। গেমটা তোকে ফ্রি মাইন্ডে এনজয় করতে হবে।'

'তুই এত সিওর হচ্ছিস কীভাবে ইয়ার?' বিনায়ক অবাক হল। 'তুই শালা কী একটা ডাউনলোড করছিস বলছিলি তখন— সেটা কী ছিল?'

'একটা মেয়ে। আই ফাক্‌ড হার। কিন্তু ফাইনালি আমি দেখলাম ঋতমের মরে যাওয়া গার্ল ফ্রেন্ডকে। সেটা অবশ্য আমার মেন্টাল উইকনেসের ফল।'

বিনায়ক হতভম্ব চোখে কয়েক সেকেন্ড হিমেশের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'কী বলছিস' ইয়ার কিছু বুঝতে পারছি না। ব্যালেরিনা আসছে কোত্থেকে?'

'ইল্যুশন ইয়ার।' বিয়ারের গেলাস ফাঁকা করে বলল হিমেশ। 'একটা মেয়ে ডাউনলোড হচ্ছে। তুই তাঁর সঙ্গে সেক্স করছিস। বাট শি ওয়জ নট রিয়াল। তোর মন যেমন ভাববে মেয়েটা তেমন হবে।'

হিমেশ চুপ করল। বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা হল না আর। এক সময় নীরবতা ভেঙে খুক খুক করে হাসতে শুরু করল বিনায়ক। হাসতে হাসতেই বলল, 'হোয়াটা ফাকিং গেম উই গট ইয়ার! হোয়াটা ফাকিং—!'

হিমেশ কোনও জবাব না দিয়ে হাসল একটু। সোফায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। তাঁর ঘুম পাচ্ছিল। কয়েক মিনিট পর বিনায়ক দেখল সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটু পরে দ্বিতীয় সোফায় বিনায়কও ঘুমিয়ে পড়ল।

৭

সকাল ন'টার একটু আগে প্রথমে ঘুম ভাঙল হিমেশের। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল বিনায়কের নাক তখনও ডাকছে। টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে ঘড়ি দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করল কয়েকটা মিসড্‌ কল। ঋতম্‌ ফোন করেছিল সকাল সাড়ে সাতটা থেকে পর পর সাত বার। সঙ্গে সঙ্গে রিং ব্যাক করল সে। ঋতম্‌ বোধহয় ফোনের অপেক্ষাতেই ছিল এতক্ষণ। রিং হতেই ফোন ধরল সে।

'কী ব্যপার? সকাল থেকে এতবার ফোন?'

'তুই শিলিগুড়িতে?' ঋতমের চাপা গলা শোনা গেল। 'বিনায়কের ফোন বন্ধ।'

'বিনায়ক তো আমার ফ্ল্যাটে। ঘুমোচ্ছে।'

'তোরা একসঙ্গে?'

'হ্যাঁ। তুই কোথায়?'

'কাল বিকেল থেকে জলপাইগুড়িতে। তোরা আসতে পারবি?'

'জলপাইগুড়ি? তোর ফ্ল্যাটে?'

'আমি হোটেলে আছি। তোরা এলে খুব ভাল হয়।'

'কী হয়েছে ঋতম্‌?' হিমেশ ধাঁধায় পড়ল। ঋতমের গলা অন্য রকম শোনাচ্ছে। কোনও কারণে সে খুব সিরিয়াস।

'শোন হিমেশ। এখন কিছু বলছি না। বাট্‌ তুই আর বিনায়ক চলে আয়। এখুনি রওনা দে। দেয়ার আর সামথিঙ ভেরি মিস্টিরিয়াস। প্লীজ!'

'ওকে, ওকে! আমরা এখুনি বের হচ্ছি।'

বিনায়ককে জাগিয়ে ঋতমের ফোনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে ওরা বের হতে হতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল।

হিমেশ গেমটা চালু করল। কী ডাউনলোড হল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সে যেটা টের পাচ্ছে সেটা হল একটা সুগন্ধ। হালকা কিন্তু মিষ্টি একটা গন্ধ। গন্ধের উৎসটা এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজে পেল না সে। নাক টানতে টানতে খানিকক্ষণ ঘরের কোণাগুলো পরীক্ষা করে রুমের দরজা ঠেলে বের হতে গিয়ে থমকে গেল প্রচণ্ড বিস্ময়ে। কয়েক সেকেন্ড কোনও কথাই বলতে পারল না।

দু-জনের বেশ খিদে পেয়েছিল। তাই রাস্তায় খাওয়া দাওয়া সেরে জলপাইগুড়ি শহরে ঢুকতে ঢুকতে বাজল প্রায় বারোটা। বিনায়ককে ঘুমে পেয়েছিল। গাড়িতে সে ঘুমোতে ঘুমোতেই এল। ঋতমের সঙ্গে দেখা করার জন্য কেন জরুরি ভিত্তিতে জলপাইগুড়ি যাওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে নি সে। তাঁদের গাড়ি জলপাইগুড়িতে ঢোকার পর সে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হোয়াট দ্য ফাকিং থিং উই আর ডুয়িং নাও?'

'জলপাইগুড়ি চলে এসেছি। এই রাস্তায় একটা হোটেলে ঋতম্‌ ওয়েট করছে।'

'বারমুডা আর টি শার্ট পরে এই প্রথম শিলিগুড়ির বাইরে এলাম। মনে হচ্ছে উই আর ইন ট্র্যাপ।'

'মানে?' এক ঝলক বিনায়কের মুখটা দেখে নিল হিমেশ। তাঁকে বেশ ফুরফুরেই দেখাচ্ছিল। কথাটা সে লঘু সুরেই বলেছে।'

'গাড়িতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম। কে জানি বলছিল, ইউ আর ইন ট্র্যাপ।'

'কে বলছিল?'

'ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং ইয়ার— গলাটা ব্যালেরিনার মত।'

বলে হো হো করে এক চোট হেসে নিল বিনায়ক। হিমেশও হাসল। বলল, 'ভয় পাস নি তবে?'

'ইউ অ্যাডভাইজড্‌ টু বী ডেয়ারিং। একটা মেয়ে যদি ডাউনলোড করা যায় তবে শালা ব্যালেরিনাকেও ডাউনলোড করা যাবে— দেন হোয়াই নট ফাক্‌ হার?'

হোটেলটা দেখা যাচ্ছিল। হিমেশ গাড়িটা সেদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে জায়গা মত পার্ক করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'খারাপ বলিস নি। হতে পারে উই মে বী ট্র্যাপড্‌ ইন ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড। তবে ঋতমকে আগে কিছু বলিস না। ওর কী হয়েছে আগে শুনব।'

'তারপর বলব ডেয়ারিং হতে?'

'একদম।'

হোটেলের ঘরে টেবিলে বোতল আর আর গেলাস সাজিয়ে ঋতম্‌ ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। হিমেশ লক্ষ্য করল যে সে বেশ স্বাভাবিক। হুইস্কি দেখে বিনায়ক আর দেরি করে নি। বড় একটা পেগ বানিয়ে এক চুমুকে সেটা শেষ করে ঋতম্‌কে বলল, 'অনেক দিন পর দেখা হল। হুইস্কি দিয়ে ওয়েলকাম করলি। কিন্তু হোয়াই আর ইউ হেয়ার? তোর তো এখানে একটা ফ্ল্যাট আছে।'

ঋতম্‌ নিরুত্তাপ গলায় পাল্টা জিগ্যেস করল, 'তোরা কাল কোনও প্রোগ্রাম করেছিলি নাকি?'

'সেটা পরে বলছি।' হিমেশ জবাব দিল। 'তোরটা আগে বল। কী জানি মিস্টিরিয়াস বলছিলি? হোয়াটস্‌ দ্যাট?'

ঋতম্‌ তখনই কিছু না বলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। হিমেশ অপেক্ষা করল। ঋতম্‌ কিছু বলার জন্য নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে সম্ভবত।

'এনিথিং রং ইয়ার?'

হিমেশ একটু অপেক্ষা করে জিগ্যেস করল। ঋতম্‌ এবার যেন আপন মনেই বলল, 'এভরিথিং রং ইয়ার। আমি জলপাইগুড়ি এসেছি রাধুকে ফলো করে।'

'রাধু?' বেশ অবাক হল হিমেশ। বিনায়কের দিকে তাকাল। সেও অবাক। 'রাধুকে কোথায় পেলি তুই?'

'গতকালের ঘটনা। আমি গয়েরকাটা থেকে ফিরছিলাম। ময়নাগুড়ি এসে মোবাইল রিচার্জ করাব বলে বাজারের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামতেই দেখলাম রাধুকে। জাস্ট বিশ-পঁচিশ ফিট দূরে। একটা স্টেট বাসে ওঠার চেষ্টা করছিল ভিড় ঠেলে।'

'তারপর?'

'আমি বাসটাকে ফলো করে জলপাইগুড়ি এলাম। রাধু বাস থেকে নেমে টোটো ধরল। তারপর যেখানে নামল, সেই বিল্ডিং-এ আমাদের ফ্ল্যাট।'

'ইজ ইট কোইন্সিডেন্ট ইয়ার?' বিনায়ক লাফিয়ে উঠল প্রায়। 'তুই কি সে কারণেই হোটেলে?'

'ব্যালেরিনার কেসটা ফিনিশ হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমি জলপাইগুড়ির ফ্ল্যাটটায় একদিনও থাকি নি। ইনফ্যাক্ট আই উড ফিল আনকমফর্টেবল্‌। কিন্তু সিকিউরিটির কাছে খোঁজ নিয়ে যেটা জানলাম সেটা এখনও বলি নি।'

'হোয়াটস্‌ দ্যাট?' হিমেশ আরেক দফা হুইস্কি গেলাসে ঢালতে গিয়ে থেমে গেল।

'রাধু যার সঙ্গে দেখা করতে সে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল সেটা আমার ফ্ল্যাটের ঠিক উল্টো দিকে। কয়েক সপ্তাহ আগে সে ফ্ল্যাটে এক মহিলা ভাড়া এসেছেন। তাঁর নাম নয়না রবাবী।'

'হো-য়া-ট!!!' হিমেশ বিস্ময়ে ফেটে পড়ল। 'সে ফ্ল্যাটটা তো ব্যালেরিনার দাদার ছিল।'

'দে হ্যাভ বিন ইন গ্যাংটক ফর টু ইয়ার্স। আপাততঃ এদিকে ফিরবে না। তাই ভাড়া দেয়। এজেন্টও ঠিক

করা আছে।'

'ওকে ওকে!' ছোট একটা পেগ গলায় ঢেলে হিমেশ এবার দাঁড়াল। 'নয়না রবাবী সে ফ্ল্যাটে ভাড়া আসতেই পারে। দিস ইজ নর্মাল। বাট হোয়াই ডিড দ্যাট বাগার কাম টু ভিজিট হার? উই শুড নট ফরগেট হি ইজ আ সুপারি কিলার। নয়না রবাবী কি তাঁকে সুপারি দিচ্ছে?'

'রাধু ময়নাগুড়ি এসেছিল কেন?' ঋতম এবার প্রশ্নটা করে তাকিয়ে থাকল হিমেশের দিকে। হিমেশ সহসা কোনও জবাব না খুঁজে পেয়ে বসে পড়ল আবার। বিনায়ক বিড়বিড় করে বলল, 'তোকে মারার জন্যও সুপারি দিতে পারে ঋতম!'

'থ্যাঙ্কিউ বিনায়ক!' শুকনো হাসি হেসে বলল ঋতম। 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। রাধু রেইকি করতে ময়নাগুড়ি গেছিল।'

'বাট হোয়াই ইজ দ্যাট ফাকিং লেডি ডুয়িং সো?' হিমেশ আবার নিজেকে ফিরে পেল। 'সে তোকে মারবে কেন? রাধুকেই বা সে কী ভাবে কন্টাক্ট করল? ব্যালেরিনার কেসটার পর রাধু আর এদিকে কয়েক বছর আসবে না বলেছিল।'

'আই থিঙ্ক ইটস্ আ কন্সপিরেসি। আমাদের যা করার একসঙ্গে মিলে করতে হবে।' ঋতম এতক্ষণে সুরার প্রতি আগ্রহ দেখাল। বড় এক পাত্র বানিয়ে বড় একটা চুমুক দিল সে। 'আমরা তিনজন আমার ফ্ল্যাটে থাকব দু-একদিন। সিকিউরিটিকে বলে রাখব রাধু এলেই যেন আমাদের ফোন করে দেয়। পারলে আজ থেকেই থাকব আমরা।'

'আজকে না।' বিনায়ক সোজা হয়ে বসল। শান্ত গলায় বলল, 'আমার একটা পিস্তল আছে। সেটা নিয়ে কাল আসব। আজকের দিনটা তুই হোটেলে থাক ঋতম। উই শুড বি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড বিফোর স্টার্টিং অ্যাকশান।'

'ইয়েস!' হিমেশ নিজের হাঁটুতে থাপ্পড় দিল একটা। 'আমারও একটা নাইন এম এম আছে। আমরা কাল দুপুরের মধ্যেই এখানে চলে আসছি। তারপর তোর ফ্ল্যাটে পজিশন নেব।'

আরও ঘণ্টাখানেক নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোচনার পর হিমেশ আর বিনায়ক বেরিয়ে গেল শিলিগুড়ির উদ্দেশে। ঋতম রুম সার্ভিসে ফোন করল। ঘরে অনেক জলের বোতল, গেলাস আর খাবারের প্লেট জমে গেছে। হুইস্কি যা ছিল সিংহভাগই উড়িয়ে দিয়েছে হিমেশরা। একটা ছোট বোতল আনিয়ে শান্ত মাথায় বসে বসে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।

কিন্তু ভাবনা চিন্তা করে কি কোনও থৈ পাওয়া যাচ্ছে? গেমটা নিয়ে কয়েক দিন মেতে থাকার পর ঋতম যখন প্রথমবার ডাউনলোড অপশনটা পেল, গোলমালের শুরু তখন থেকেই। কয়েক হাতের মধ্যে একটি নগ্ন, ধারাল নারী শরীর দেখার পর প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। মেয়েটাকে কয়েক পলকের জন্য মনে হয়েছিল ব্যালেরিনা। কোনও রকমে ডিলিট বাটনে চাপ দিয়ে দু-হাতে চোখ ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিল ঋতম। তারপর সামলে উঠে ফোন করেছিল নয়না রবাবীকে। সে অবশ্য ঋতমকে বুঝিয়ে দিয়েছিল সব কিছু। ঋতমও মেনে নিয়েছিল যে সে ভয় পেয়ে গেছিল। কিন্তু ডাউনলোড করার সাহস দ্বিতীয় বার পায় নি। এমন কি গেমটাও খেলে নি আর। একই এক্সপিরিয়েন্স হিমেশেরও হয়েছে। তবে হিমেশ সেই মেয়েটাকে বিছানায় নিয়ে সেক্স করেছিল। তারপর ব্যালেরিনার ভূত দেখেছে। বিনায়কের ক্ষেত্রে অবশ্য ডাউনলোডের ব্যাপার ঘটে নি। কিন্তু তাঁর সিগারেট নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে।

তা ছাড়া বিনায়কের একটা কথা খুব সত্যি মনে হয়েছে ঋতমের। সে বলছিল, 'সামথিং এক্জিস্ট ইন মাই রুম।' এটা খুবই সম্ভব। গেমটা নিছকগেম নয়। ডাউনলোড এপিসোডের পর থেকে ঋতমের মনে হয়েছে যে গেমটার মধ্যে কিছু একটা একজিস্ট করে।

রুম সার্ভিস এসে ঘর পরিষ্কার করে ঋতমের প্রিয় হুইস্কি দিয়ে গেছে ছোট এক বোতল। সামান্য জল মিশিয়ে সেটা সে গলায় ঢালল সে। রাধু মাহাত আর নয়না রবাবীর যোগাযোগটা তাঁকে খুব ভাবাচ্ছে। নয়না রবাবীকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ফোনে পাওয়া যায়। মেয়েটা কি ঘুমোয় না? নাকি এর মধ্যে কোনও চালাকি আছে? তা ছাড়া, ডাউনলোড করার পর যে শরীরটা তাঁর সামনে এসেছিল, সেটাকে পলকের জন্য ব্যালেরিনা বলে ভুল হয়েছিল ঋতমের। হিমেশেরও তাই হয়েছিল।

গেমটা নিয়ে কয়েক দিন মেতে থাকার পর ঋতম যখন প্রথমবার ডাউনলোড অপশনটা পেল, গোলমালের শুরু তখন থেকেই। কয়েক হাতের মধ্যে একটি নগ্ন, ধারাল নারী শরীর দেখার পর প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। মেয়েটাকে কয়েক পলকের জন্য মনে হয়েছিল ব্যালেরিনা। কোনও রকমে ডিলিট বাটনে চাপ দিয়ে দু-হাতে চোখ ঢেকে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিল ঋতম। তারপর সামলে উঠে ফোন করেছিল নয়না রবাবীকে। সে অবশ্য ঋতমকে বুঝিয়ে দিয়েছিল সব কিছু। ঋতমও মেনে নিয়েছিল যে সে ভয় পেয়ে গেছিল। কিন্তু ডাউনলোড করার সাহস দ্বিতীয় বার পায় নি।

ব্যালেরিনা হঠাৎ ঘুরে ফিরে চলে আসছে কেন তাঁদের মনে?

ঋতম আরেকটু খেল। এবার একটু ঝিম ঝিম ভাব আসছে। মাথা পরিষ্কার হচ্ছে। সোফায় হেলান দিয়ে সে বিড়বিড় করে বলল, 'রাধুর সঙ্গে একবার দেখা হওয়া জরুরি। আমি বলেছিলাম ব্যালেরিনাকে জাস্ট গুলি করে মেরে ফেলতে। নো পেইন, জাস্ট কিল। কিন্তু ওকে রেপ করল কেন? রেপ ওয়াজ নট ফেয়ার—।'

ইন্টারকমটা টি টি করে উঠল। একটু বিরক্ত হয়ে সোফা ছেড়ে ফোনটার কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে ঋতম 'হ্যালো' বলতেই রিসেপশন থেকে জানাল যে এক ব্যক্তি দেখা করতে চায়। নাম বলেছে 'রাধু মাহাত'।

মুহূর্তের মধ্যে নেশা ছুটে গেল ঋতমের। মিনিট কয়েক পর টোকা পড়ল দরজায়। ঋতম দরজাটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ইয়েস।'

দরজা খুলে ঢুকল রাধু মাহাত। তাঁর চোখে কিঞ্চিৎ বিস্ময়। ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'কাল মায়নাগোড়ি তক্ গিয়া আপনাকে মিট করব বোলে। লেকিন ইউ আউট অফ স্টিশান।'

'কী করে জানলে আমি এখানে?'

'রাতে আপনার বাড়ির লেন্ড লাইন মে ফোন কোর্লাম। সিখান থিকে ইনফর্মেশন মিলল কি আপনি জাল্পাইগোড়ি। হোটেলের নাম ভি বোলিল। সায়দ ফোন আপকো ড্যাডি নে রিসিব কিয়া থা।'

'বোসো।' ঋতম সতর্ক গলায় বলল। রাধু মাহাত বসল মুখোমুখি।

'আমার খোঁজে ময়নাগুড়ি গেছিলে কেন?'

'আপনি কি আমার পার্সোনাল নাম্বার কোনও লেডিজকে দিলেন?'

'না।' বেশ অবাক হল ঋতম। 'সে নাম্বার আমার কাছে আর নেই। থাকলেও কাউকে দিতাম না।

ঋতমের প্রতিক্রিয়া পেয়ে একটু চুপ করে থাকল রাধু মাহাত। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আমিও তেমনই শোচলম্। এই ধরেন পন্দ্র বিশ দিন আগে আমি তখন চিকমাগালুরে একটা ডিল কোর্ছি— একটা ফোন এলো। এক লেডিজ ভয়েজ বোল্লো কী সে নাম্বার পেয়েছে আপনার থেকে। তাঁর একটা কেস আছে। আমি বোল্লোম্, হয়ে যাবে। ঋতমবাবু রেফ্‌রেন্স দিচ্ছেন— হয়ে যাবে। লেকিন ফিফ্‌টি থাউজেন্ড আডভান্স দিতে হোবে ক্যাশে। আমি কলকাত্তা থেকে লোক ভেজে দিব জাল্পাইগোড়ি। ক্যাশ তাঁকে হেন্ডোভার কোরে দিবেন তো আমি আপনাকে মিট কোরিয়ে নিব।'

'টাকা দিয়েছিল নিশ্চই?'

'নৈলে আমি আসব কেনো? আমি কাল এনজেপি নামলম। তার্পর ডিরেক্ট এলাম মায়নাগোড়ি। আপনাকে পেলাম না তো জাল্পাইগোড়ি এসে পার্টিকে মিট কোর্লাম।'

'পার্টির নাম কী?' উত্তরটা জানা আছে ঋতমের। তবুও জিগ্যেস করল। রাধু মাহাত অবশ্য একবারেই জানিয়ে দিল যে সেই 'লেডিস পার্টি'র নাম নয়না রবাবী। কিন্তু কাজটা কী, তা বলে নি। সেটা দু-তিনদিনের মধ্যেই জানিয়ে দেবে।

এসব শুনে ঋতম চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল। চোখ খুলতেই দেখল রাধু অসীম আগ্রহে তাঁর কথা শোনার জন্য তাকিয়ে আছে। সে মদ খায় না। ঋতম বোতলের বাকি হুইস্কি গলায় ঢেলে মুখ মুছে রাধু মাহাতর চোখের দিকে তাকিয়ে কাটা কাটা স্বরে বলল, 'ঠিক কী হচ্ছে সেটা আমার জানা নেই রাধু। কিন্তু যা হচ্ছে তা মোটেই ভাল নয়। তুমি ব্যালেরিনাকে রেপ করেছিলে?'

রাধু হাঁ হয়ে গেল বিস্ময়ে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ফিস ফিস করে বলতে লাগল, 'নেহি নেহি! রেপ ম্যায়নে নেহি কিয়া। হাম কভি লড়কী কা ইজ্জত লুটলম্ না ঋতমবাবু। ম্যায় এক কিলার হুঁ। রেপ আপনার ফেন্ড দু-জন কোর্লো।'

'শিট্!!'

মুখ বিকৃত করে শব্দটা উচ্চারণ করল ঋতম। ফোন করে আরও একটা বোতল আনতে বলল। ঋতমের হাবভাব ভাল করে লক্ষ্য করছিল রাধু মাহাত। এবার সে আস্তে করে বলল, 'কোন ঝামেলা ঋতমবাবু? আপনি আপসেট হোলেন?'

'ওই লেডিজ পার্টির থেকে সাবধান থেকো রাধু। খবর নাও সে আমাকে চিনল কীভাবে। তোমার পার্সোনাল নাম্বার সে পেল কোথায়?'

রাধু মাহাত মুচকি হেসে বলল, 'গড়বড় আছে তা আমি বুঝে নিয়েছি। আপনি বেসি চাপ নেবেন না। পচাশ্ হাজার তো পেলম্। দোরকার হোলে লেডিজ পার্টিকে ওর ফেলাটে নামিয়ে দিয়ে চোলে যাবো। আমার নাম রাধু মাহাত আছে আপনি জানেন।'

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

যেন তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়ি

ডুয়ার্সের মেয়েবেলা

কবে থেকে যে কথাটা 'মেয়েবেলা' হয়ে গেল কে জানে! 'ছেলেবেলা'তে এত আপত্তি কেন? আমিও তো কত স্বপ্ন দেখেছিলাম যেন বিদেশ ঘুরে মা-কে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে ঢাল-তরোয়াল ঝনঝনিয়ে বাজে। আমি তখনও নিজেকে লিঙ্গ-ভিত্তিক শিশু-কিশোর ভাবতে শিখিনি। ফলে কাকুগুলো কী করে পায়ে দড়ি বেঁধে নারকোল গাছে চড়ে সেটাও চেষ্টা করে দেখেছিলাম। কিন্তু যেদিন প্রথম আমার মা আমাকে বোঝাল যে আজ থেকে আমি 'মেয়ে' হলাম সেদিন মনে হয়েছিল মেয়ে হওয়ার মত যন্ত্রণা বোধহয় আর কিছুতে নেই। ছেলেদের তো এমন কিছু হয় না যা লোকজন থেকে ঢাকতে হয়, আড়াল করতে হয়! আমার যেখানে সেখানে জামা পাল্টানো বন্ধ হল। মাসের কয়েকটা দিনের গোপন গল্প সবচাইতে প্রিয় বন্ধু বাবাকেও বলতে নেই; মা শিখিয়েছিল। কারণ, বাবা পুরুষ বলে। মাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম, বাবাকে বললে কিচ্ছু হবে না, কারণ, যেখানে সারাদিনের সব কথা বাবাকে না বললে আমার শান্তি হত না, সেখানে এত বড় একটা ঘটনা বাবাকে না বলে থাকব কী করে! মা বলত 'না, সব কথা বাবাকে বলবে না'। অথচ বাবা যে সবটাই জানেন তা তো আমি বুঝিনি। অকারণ, অযৌক্তিক এই গোপনীয়তার কী-ই বা প্রয়োজন ছিল তা আজ অবদি বুঝে উঠতে পারিনি, বিশেষত জীববিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়ার পর থেকে। বাবা বন্ধুই থেকে গেছে। মনে মনে সব কথা হয়েছে। এমনকি আমি যখন সন্তানসম্ভবা, মা তখন আর নেই, বাবার আদর-যত্ন কোনও অংশে মায়ের চাইতে কম পাইনি।

আমার নিজের তিস্তা-করলা ছাড়া বাইরে প্রথম দেখা নদী হল নেওড়া। দাদু নেওড়া নদী চা-বাগানের ফিটারবাবু ছিলেন। ফলে ওই কোয়ার্টারে মাঝে মাঝে চলে যাওয়াটা দারুণ একটা উত্তেজনার ব্যাপার ছিল। আমি বড়ই ছোট তখন, ফলে আমাকে অন্য কারুর সঙ্গে একলা ছেড়ে মা শান্তি পেতেন না। তবু দু-একবারের কথা একটু একটু মনে আছে। তখনও আমি লিঙ্গভিত্তিক কৈশোরে পা দিইনি। ফলে যত্রতত্র জামা খুলে ফেলাতে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। নদীতে তেমন জল ছিল না বলেই বোধহয়, এক্কেবারে বসে পড়লাম জলের মধ্যে। আদুল গায়ে বালি মেখে উঠলাম। আমাকে একলা ওই অবস্থায় দেখে আমাদের বাড়ির দায়িত্বশীল অভিভাবক কুলি রাম আমাকে জল থেকে তুলল, গা ধোয়াল, তারপর বকতে বকতে কোয়ার্টারে ফিরিয়ে নিয়ে এল। বাড়িতে এসে দেখি মালা আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। অ্যালশেসিয়ান মালা। ইয়াব্বড় চেহারা। দাদুকে ছাড়া কাউকে চিনত না। আমি ওকে আদর করতাম, বকতাম, কান মলে দিতাম, কিন্তু এখন মনে হয়, ও-ও বোধহয় আমাকে বাচ্চামানুষ হিসেবেই ট্রিট করত, যার ফলে গার্ডিয়ানগিরি ফলাত যতটা, ততটা ঠিক আমাকে পাত্তা দিত না। ভাবখানা এই, 'যা তো, মেলা ঝামেলা করিস না'। কিন্তু আমি যে বাড়িতে নেই ও কিন্তু ঠিক গেটের সামনে বসেছিল, এলাম যখন উঠে দাঁড়াল, আমাকে দেখেই ভৌ ভৌ করে কী যে বকল, আমি সম্যক সেটা বুঝলাম, ভয়ও পেলাম, তারপর ঘরে চলে গেল।

এই বড়বেলায় চাকরি করতে নেওড়া নদী চা-বাগানে গিয়েছিলাম। কাজ হয়ে গেলে ধীর পায়ে নদীর দিকে যেতাম। একদিন না, বেশ কয়েকদিন গিয়েছিলাম ছোটবেলা খুঁজতে। ছিন্নভিন্ন করে হাতড়েছি। উঁহু, কোত্থাও আমার সেই নেওড়া নদীকে আর খুঁজে পেলাম না। এতদিনে আমার কথা ভুলেই গেছে সে! আমি কিন্তু সোনালি মোড়কের আড়ালে আমার হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলার পাতায় ঠিক

যেদিন প্রথম আমার মা আমাকে বোঝাল যে আজ থেকে আমি 'মেয়ে' হলাম সেদিন মনে হয়েছিল মেয়ে হওয়ার মত যন্ত্রণা বোধহয় আর কিছুতে নেই। ছেলেদের তো এমন কিছু হয় না যা লোকজন থেকে ঢাকতে হয়, আড়াল করতে হয়! আমার যেখানে সেখানে জামা পাল্টানো বন্ধ হল। মাসের কয়েকটা দিনের গোপন গল্প সবচাইতে প্রিয় বন্ধু বাবাকেও বলতে নেই; মা শিখিয়েছিল। কারণ, বাবা পুরুষ বলে।

লুকিয়ে রেখেছি তাকে। বুকে করে।

আমার মা চাকরি করতেন বলে আমাকে মামার বাড়িতেই সারাদিন থাকতে হত। সকালে বাড়ি থেকে স্কুল চলে যেতাম। তখন মর্নিং স্কুল। ফিরে আসতাম এগারোটায়। কোথায় থাকব? মামার বাড়িতে। মামা-বাড়িতে তখন দাদু, দিদা, দুই মাসি, দুই মামা, লক্ষ্মীদি সবাই মিলে হৈ হৈ ব্যাপার। আমার জীবনের সবচাইতে আনন্দের দিনগুলো কেটেছে ওই সময়। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল চারটে বাজলেই ডুগডুগি বাজিয়ে বাক্স কাঁধে নিয়ে কাঠি-বরফওয়ালা আমাদের গেটের সামনে হাজির। আমিই দৌড়ে গিয়ে তাকে উঠোনে নিয়ে আসতাম সাদরে। সবাই মিলে উঠোনে গোল হয়ে বসে আড্ডা দিতে দিতে বরফ খাওয়া, উফ্। বড্ড হাসি পাচ্ছে লিখতে গিয়ে, আড্ডাবাজ কী আর আমি এমনি হয়েছি! কোনও কোনও দিন এমনও হয়েছে টিনের চালের ওপর আমাকে উঠিয়ে দিয়েছে বড়মামা, কখনও বা কাঠের বাড়ি বলে তার প্ল্যাংকিনের তলায় ঢুকে লুকিয়ে থেকেছি দুষ্টুমি করে।

বাবা খুব বেড়াতে ভালবাসতেন বলে মাঝে মাঝে ডুয়ার্সে এদিক ওদিক নিয়ে যেতেন আমাদের। বাবা কলকাতার ছেলে ছিলেন। চাকরি পেয়ে চলে এসেছিলেন জলপাইগুড়িতে। ফলে আত্মীয়পরিজনেরা আমাদের বাড়িতে থাকতে এলে ডুয়ার্সে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের জায়গা দেখানোর মধ্যে অদ্ভুত একটা আনন্দ পেতেন দেখেছি। খুব ভালবাসতেন সেবকে যেতে। আর ভালবাসতেন হলং বাংলোতে রাত কাটাতে। সমুদ্র আর পাহাড়ের মধ্যে কোনটা বেশি ভালবাস জিজ্ঞাসা করলে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে বলতেন পাহাড়। দার্জিলিং শহরকে এত ভালবেসেছেন যে বছর দুয়েক বাদে বাদেই দু'দিনের জন্য চলে যেতেন আর বলতেন শুধুমাত্র ম্যালে গিয়ে বসে থাকতেই নাকি ভাল লাগে। হার্টের সমস্যা ছিল বলে পাহাড়ে চড়ায় বিধিনিষেধ ছিল অনেক, তবুও মৃত্যুর দু'বছর আগেও একবার ঘুরে এসেছেন, বলেছেন, "এই বোধহয় শেষবার, আর মনে হয় যেতে পারব না, শরীরটা আর দেয় না বেশ বুঝতে পারি"। এই জায়গাগুলো তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার ছোটবেলাটাও আলো করে আছে। বাবা-ই আমাকে চিনিয়েছেন সবুজ গালিচা আর বুনো ফুলের গন্ধ। পথে ঘাটে পায়ে দলে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করে যে গাছগুলো তাদের কোলেও যে কত সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট ফুল ফোটে, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'নীলমণিলতা'র মত অবহেলিত কিন্তু রূপসী, দেখতাম ডুয়ার্সে বেড়াতে গিয়ে। প্রকৃতি আমাদের চেতনাকে এভাবেই সমৃদ্ধ করে নীরবে, কোনও আত্মম্ভরিতা নেই। অথচ আমরা কেউই সেটা বুঝতেও পারি না। ডুয়ার্স আমার ছোটবেলাকার প্রকৃতিপাঠের প্রথমভাগ। এসবের বাইরেও যে একটা বড় ডুয়ার্স আছে তা জেনেছি অনেক পরে।

বাজার যাওয়ার ছবিটা বড্ড পালটে গেছে এখন। আর পাল্টেছে মাসকাবারির হিসেবের খাতা। সত্তরের দশকের শেষ থেকে আশির দশকের কথা বলছি। প্রতিদিন দশ টাকা পকেটে ঢুকিয়ে বাবা বাজারে যেতেন। তখন রেফ্রিজারেটর নেই। তাই রোজ বাজার। ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে এসে মাকে আবার হিসেব বুঝিয়ে দিতেন। এক টাকার হিসেব না মিললেও মা চেপে ধরতেন। বাবা বোকার মত হাসতেন, টাকা মারার কোনও উপায় নেই। আসলে এক টাকা মানে তখন যথেষ্ট। দশ টাকার বাজারে প্রতিদিন মাছও হয়ে যেত, সেই সঙ্গে সবজি। বাবার বাজার করার একটা মজার গল্প করি। মা বলে দিলেন, "ইলিশ মাছ আনলে এক ফালি মিষ্টি কুমড়ো এনো তো, আর যদি ইলিশ মাছ ভাল না পাও তাহলে মাগুর মাছ এনো, সাথে কাঁচকলা"। বাবা কপাল মাথা সব চুলকে ব্যাপারটা যতটা সম্ভব বোঝার চেষ্টা করে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেলেন। ঘণ্টা

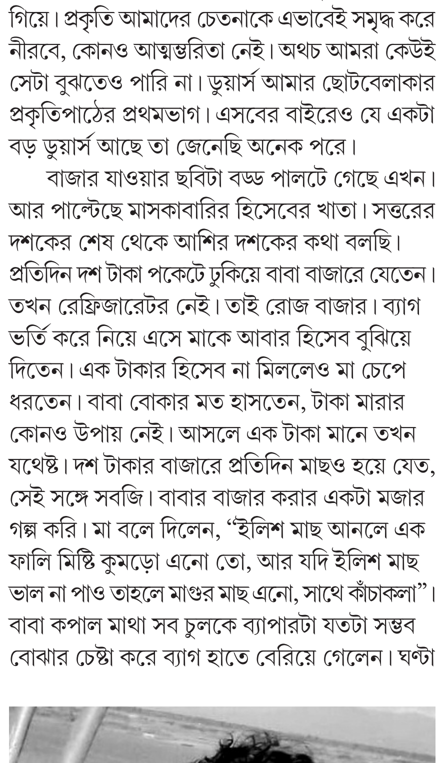

খানেক পর ফিরে এসে রান্নাঘরে ব্যাগ রেখে স্নানে চলে গেলেন। মা ব্যাগ ঢেলে যা দেখলেন তাতে কেঁদেই ফেলবেন আর কি। ইলিশ আর কাঁচকলা। ভ্যাঁ করে কাঁদতে যাবেন ঠিক তখনই বাবার প্রবেশ। ব্যাস্। বাবার মুখে কোনও জবাব নেই, কেটে পড়েছেন পড়ার ঘরে, কিন্তু রান্নাঘরে চলতে লাগল ভয়ংকর বিস্ফোরণ। এ দুটোকে দিয়ে আমি কী করব! শেষকালে অবশ্য অপূর্ব স্বাদের কালোজিরে কাঁচালংকা দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল হয়েছিল মনে আছে। আসলে মা-ও স্কুলে যাবেন দশটায়, তারই মধ্যে রান্না করে বেরোনো, ভুলেও যদি সাপ্তাহিক দিনগুলোয় কোনওদিন চুনো-মাছ এনে ফেললেন তাহলে রাম ধোলাই খাওয়া থেকে কেউ বাঁচাতে পারত না বাবাকে। তখন বাজার থেকে কেটে আনার ব্যবস্থা ছিল না বলেই এই যন্ত্রণা পোহাতে হয়েছে মাকে। আমি মেয়ে হয়ে এখন বুঝি, মেয়েদের এই বড় বড় সমস্যাগুলোকে বাড়ির পুরুষেরা বরাবর তুচ্ছই ভেবে এসেছেন। বুঝতেই পারতেন না বোধহয়। মা ঘুম থেকে উঠে সেই যে রান্নাঘরে ঢুকলেন, কোনও কোনও দিন স্নান করে ভেজা চুলেই এমনকি হয়ত বা টপটপ করে জল পড়া অবস্থাতেই ছুটলেন স্কুলে। প্রায়ই দেখতাম ওষুধ খেতে ভুলে যেতেন। এখন কষ্ট হয়, আমার মেয়েবেলায় মায়ের অনেক কাজ আমি করে দিইনি কেন!

জলদাপাড়ায় থাকতে গিয়ে প্রথম যেবার হাতির পিঠে চড়েছিলাম স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমি বারো-তেরো হব। খুব তো কায়দা মেরে উঠতে যাচ্ছি যেন আমার অনেককালের অভ্যেস, যেই না হাতি বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে আমি পেছনে উলটে পড়ি আর কি। বাপ্‌রে! মাহুতভাই আমাকে না ধরলে... । আমি সেদিন প্রথম যেমন হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলের জংলি গন্ধ নাকে নিতে বেরিয়েছি তেমনি এই তো প্রথম এতো কাছ থেকে হাতিকে ছুঁতে পারলাম! সে অনুভূতি! আমি মাহুতভাইয়ের ঠিক পেছনেই বসেছি, তারপর বাবা, তারপর মা। আমি কেবল হাতির গা ছুঁই। কান দুটো কেমন করে নাড়ায় সেটা লক্ষ্য করি মনযোগ দিয়ে। মাহুত কীরকমভাবে কমান্ড করে, সব সেদিন আমার কাছে নতুন। হাতি তার ইচ্ছে হলেই দাঁড়িয়ে পড়ছে কোথাও কোথাও, শুঁড় তুলে গাছের পাতা ছিঁড়ে আনছে, মুখে পুরে দিচ্ছে। আমার বড্ড কৌতূহল ছিল হাতির মুখ কোথায় এই নিয়ে। ছবিতে তো বুঝতে পারিনি। আমি হাঁ হয়ে দেখতে থাকি ওর পাতা খাওয়া। শুঁড় তুলে একবার ভুস্ করল কী কারণে যেন, সে কি শুঁড়ের দৃশ্য রে বাবা! মাহুতভাইয়ের পিঠ খামচে ধরি আমি। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভয় করছে ?" আমি সেদিন শুধু 'না' বলেছি, কিন্তু এখন বুঝি, সেদিন আমার ভয় নয়, রোমাঞ্চকর যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা সঠিক ভাষায় প্রকাশ করার আসলে কোনও ক্ষমতাই নেই আমার।

ডুয়ার্স আমার নিজের জায়গা ভাবলে আনন্দে চোখে জল আসে আমার। আমি এমন জায়গায় থাকি যেখানে শীতকালে সম্পূর্ণ সাদা কাঞ্চনজংঘা আমার ঘর থেকে দেখা যায়। ঘন নীল আকাশের প্রান্তরেখা ছুঁয়ে শুয়ে আছেন ঘুমন্ত গৌতম। ডানদিকে একটু এগোলেই ফরেস্ট আর চা-বাগিচা, বাঁয়ে এগলে পাহাড়। পাহাড় কি আবার যে-সে? একেবারে হিমালয়ান রেঞ্জ, পৃথিবীর ম্যাপে যাকে খুঁজে পেতে একটুও দেরি হয় না। বড্ড আদর করে বড় করেছে আমাকে আমার প্রাণের ডুয়ার্স। তার কোল ছেড়ে কোথাও যাব না কোনওদিন। শেষদিনেও যেন তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়ি।

শ্বেতা সরখেল

রাসায়নিক রস

প্রাথমিক অভদ্র বিদ্যালয়

'এখানে যত্ন সহকারে অসভ্যতা শেখান হয়।'

ভুরু কুঁচকে ইন্টেলেকচুয়ালের মত তাকাচ্ছেন কেন? অসভ্য হওয়া সভ্যতার অন্যতম ধর্ম। ইতিহাস পড়েন নি বুঝি? আহা! মহাপুরুষদের কথা তুলছেন কেন? সভ্য মহাপুরুষ যুগে যুগে দু-চার পিস এসেছে, আসবে। তাঁরা যা বলে গেছেন সেসব মুখস্থ করবেন। পুরোটা দরকার নেই। তিন চার লাইন মেমারিতে রাখবেন। সুযোগ পেলে ঝেড়ে দেবেন। অসভ্যতা করে এসে হাত ধুয়ে নকুলদানা খেতে খেতে সাংবাদিকদের বলবেন সে সব বাণী। তাঁরাই তো আজকাল অসভ্যতা স্পনসর করছে দাদা! চার-পাঁচ পিস সর্বজ্ঞ স্টুডিওতে ধরে এনে ঝগড়া করায়। বিজ্ঞাপণের বিরতি সমেত সে সমবেত অসভ্যতা দেখায়।

অসভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সারাক্ষণ 'মি-মি' করা। বুঝলেন না? মানে, সারাক্ষণ 'আমি আমি' করা। চারদিকে শুধুই 'মিমি' দাদা! এইসব মিমিদের বক্তব্য পাব্লিক হাঁ করে গেলে। প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের সব চাইতে বড় 'মিমি'। কিন্তু তাঁর কত্ত ভক্ত দেখুন! মিমিত্বের বিচারে দাদা মুখ্যমন্ত্রীও কম যাচ্ছেন না। পলিটিক্যাল মিমিরা প্রতি চারটে বাক্যের একটায় বলেন 'করে দিয়েছি'। শাস্ত্রে নাকি বলে যে নিজের ঢাক নিজে পেটাতে নেই? বাজে কথা! তাই যদি হবে তবে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এত 'মিমি' কেন করবেন? সমাজে যদি ভগবান-প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের ফাটাকেষ্ট দিনরাত 'মিমি' করে, তবে পাব্লিকের দোষ কোথায়?

তাই দাদা ঠিক করেছি অসভ্যতা শেখাব।

অসভ্যতা কিন্তু সায়েন্টিফিক ব্যাপার দাদা! 'অভদ্রতা' একটা বিজ্ঞান। একটা কনসেপ্ট। প্রথমে স্পিচ ট্রেনিং। কখন কথায় কথায় রবি ঠাকুর আওড়াতে হবে আর ঠিক কোন সময় প্রতি তিনটি শব্দে একটা করে 'বাল-বোকাচোদা' বলতে হবে— সেটা ট্রেনিং ছাড়া হয় না। আমাদের কাউন্সিলারের ছেলে দাদা তিন মাসের কোর্স করবে বলে ভর্তি হল এখানে। পুরোটা করল না। ফলে স্পিচে গোলমাল হয়ে গেছে। এমএলএ সাহেব তাঁকে বলেছিলেন অনুপ্রাণিত হয়ে সে যেন পাড়ার মোড়ে সকাল ছ-টা থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজায়। ছেলে জবাব দিল, 'রবি ঠাকুরের গান বাল শুনতে ইচ্ছে করে না।' ব্যস! বুথ কমিটির সম্পাদকের পদটা ছেলে হারিয়ে ফেলল। কোর্স কমপ্লিট করলে 'বাল'টা বলত না দাদা।

অসভ্যতার একটা ড্রেস কোডও আছে। সাদা পায়জামার ওপর সাদা পাঞ্জাবি। পায়ে ধুন্ধুমার জুতো। রাজীব গান্ধী চালু করেছিলেন দাদা! তখন এই ড্রেস পরে পথ হাঁটলে লোকে মুচকি হাসত। এখন গম্ভীর হয়। আমরা যে প্র্যাক্টিকাল ক্লাস করাই সেখানে এই রকম পোষাকে আমাদের স্টুডেন্টরা রাস্তায় বের হয়। একটা বাইকে তিনজন হেলমেট ছাড়া। পুলিশ থামালে ওরা এইভাবে কথা শুরু করে— 'তুমি বাঁড়া বেশি পুলিশ হয়েছ না? জানিস বাল আমি কে?'

কাজ হয়ে যায়। কিন্তু ট্রেনিং না নিলে আপনি এটা পারবেন না। আপনারা নিজেদের ফ্রাস্টু হয় বউ নয় টোটোওয়ালার ওপর ঝাড়তে পারবেন। এর বেশি দম নেই। অথচ আমাদের সার্টিফিকেট কোর্স করা স্টুডেন্টদের দেখুন। মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন উইদ কনফিডেন্স অসভ্যতা করছে! একচুয়ালি, আমরা কোর্স শেষ করার পর অন ক্যাম্পাস ইনট্রোডিউজ করাই। সব স্টুডেন্টই কোনও না কোনও নেতার শেলটারে চলে যায়। তারপর স্টুডেন্টরা কিছুদিন নেতার পেছনে হাঁটে। এটা দাদা একটা সুক্ষ্ম ব্যাপার। নেতার পেছনে হাঁটছেন। নেতার মুখ দেখতে পারছেন না। কিন্তু নেতার এক্সপ্রেশন আর পেছনে হাঁটাদের এক্সপ্রেশন যেন ক্ল্যাশ না করে! প্রথমে অবশ্য ছোট ছোট নেতার পেছনে হাঁটতে হয়। কিন্তু সেখানেই অসভ্যতার প্রথম পাঠ ঝালিয়ে নেওয়ার মস্ত সুযোগ।

মনে করুন পাড়ার যুব নেতার পেছনে স্টুডেন্ট হাঁটছে। এমন সময় কেউ নেতাকে বললেন যে তাঁর মেয়েকে পাড়ার দু-তিনটে ছেলে খুব বিরক্ত করছে আজকাল। শুনে নেতা বিস্মিত হয়ে পেছনে তাকাবেন। সঙ্গে সঙ্গে স্টুডেন্টকে বলতে হবে, 'ওনার মেয়েকে আমি চিনি দাদা! যা সব ড্রেসে বের হয়!'

তখন নেতা বলবেন, 'যান। আগে মেয়েকে ঠিক করুন। এটা ভদ্রলোকের পাড়া।'

তারপর স্টুডেন্টকে বলবেন, 'এই! তুই আমার পাশে হাঁট। কী যেন নামটা তোর?'

ট্রেনিং ছাড়া এই অসভ্যতা শেখা যায় না দাদা। আপনারা ভুলে যান যে অসভ্যতাও একটা আর্ট। নকুলদানা। ওপরে সুগার কোট, ভেতরে ছোলা— মানে আছোলা আর কি! তারপর ধরুন বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ফ্লেক্স টাঙাতে হবে পাড়ায়। বিবেকানন্দের ছবির পাশে দাদার মুখ। এটা করলেই টিভির লোক দৌড়ে আসবে। ফেসবুকে খুব পোস্ট হবে। গালাগালির বন্যা। কিন্তু দিনের শেষে দাদা বিখ্যাত। কাজটা গুছিয়ে করতে পারলেনই দাদা বলবেন, 'এই! তুই গাড়িতে আমার পাশে বোস তো! তোর নামটা যেন কী?'

এর মানে স্টুডেন্ট ওয়ার্ডে কয়েক লাখ টাকার কাজ পাচ্ছেন। কাজ পেলেই টাকা। টাকা পেলেই কনফিডেন্স।

এবারে কিন্তু স্টুডেন্টের ফিউচার খুলে গেল দাদা! সামনে অনেক অভদ্রতা। বিরোধি নিধন, এলাকা দখল, গোপনে মেয়েবাজি, ওয়ান শটার মজুত, নিজের মোটর বাইক! তিন বছর আগে যারা কোর্স কমপ্লিট করে বাজারে নেমেছে তাঁদের খোঁজ নিয়ে দেখুন। দু-হাতে লুঠছে, পেটাচ্ছে আবার কেসও দিচ্ছে। আপনার ছেলে ভদ্র হয়ে কী ফাটাচ্ছে বলুন?

আমার এখানে ভর্তি করে দিন দাদা। ভোটের সময় সাত দিনের স্পেশাল কোর্স। কাগজে নিশ্চই পড়েছেন সেন্ট্রাল ফোর্স কোথায় জানি নিজেদের মধ্যেই গন্ডগোল করে গুলি চালিয়ে একটাকে মেরে দিয়েছে! এটাও আমার স্টুডেন্টদের কাজ। গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সেন্ট্রাল ফোর্সে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

এই নিন ফর্ম। সাত দিনের ট্রেনিংটা নিলে এটা বুঝে যাবে যে ভোটের রেজাল্ট বের হলে কতদিন কোন নেতার পেছনে হাঁটবে।

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা ঊর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যুনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬

শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

*** প্রায় নিঃশেষিত

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র www. readbengalibooks.com

ডুয়ার্সের এ মাসের বই

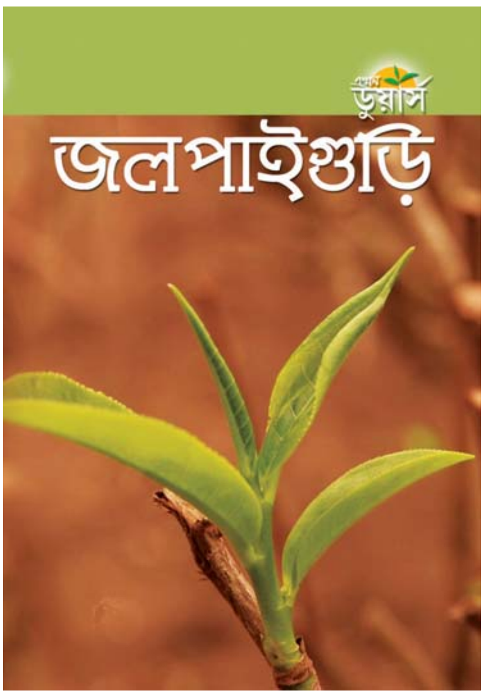

প্রকাশিত হল 'এখন ডুয়ার্স' প্রকাশনা বিভাগের তৃতীয় জেলা সংকলন 'জলপাইগুড়ি'। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার-এর পর এবার ডুয়ার্স ত্রয়ীর বৃত্ত সম্পূর্ণ হল ২৮ এপ্রিল ২০১৯ সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি রবীন্দ্রভবনে। আলাদা করে কোনও উদবোধক নয়, মঞ্চে বই প্রকাশ করলেন যাঁরা এই সংকলনে লিখেছেন তাঁরাই।

জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসের আভাস, শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। **রায়কত রাজবংশ ঃ এক রাজকর্মচারীর জবানবন্দিতে,** উমেশ শর্মা। **জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগান,** গৌতম চক্রবর্তী। **জলপাইগুড়ি জেলার পুরনো মন্দির মসজিদ গুম্ফা গির্জা,** শাঁওলি দে। **জলপাইগুড়ির নদীকথা,** নিঝুম ঠাকুর। **লোক সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে জলপাইগুড়ি,** সব্যসাচী দত্ত। **জলপাইগুড়ি সাবেক জেলার গ্রামীণ মেলা ও উৎসব,** গৌতম গুহ রায়। **জলপাইগুড়ি জেলায় নাট্যচর্চার হাল হকিকত,** তমোজিৎ রায়। **মাল ইতিবৃত্ত,** গৌতম চক্রবর্তী। **মালবাজার ঃ যা দেখি নতুন লাগে,** সব্যসাচী ঘোষ। **মাটিয়ালি কথা,** সনৎ কুমার বসু। **নাগরাকাটার উন্নয়নে কয়েকটি প্রস্তাব,** পরাণ গোপ। **ডুয়ার্সের দুয়ার ধূপগুড়ি,** অমিত কুমার দে। **ময়নাগুড়ি,** সত্যম ভট্টাচার্য। **রাজগঞ্জ,** রণজিৎ বিশ্বাস। **সার্কিট বেঞ্চ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রাথমিক জয়,** গৌতম পাল। **ক্রীড়া জগতে জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরণের অভিমুখ,** কৃষ্ণেন্দু রায়। **নারীদের স্বনির্ভরতায় জলপাইগুড়ি,** প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। **জলপাইগুড়ির পর্যটনে বেস্ট সেলার্স,** মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। **গরুমারার গেটওয়ে লাটাগুড়ি,** পরাণ গোপ। **জলপাইগুড়ি থেকে ডুয়ার্সের অমূল্য পথে স্বল্প মূল্যে,** সত্যম ভট্টাচার্য। **অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনে জলপাইগুড়ি,** ভাস্কর দাস। **বন ও বনবাংলোর রোমাঞ্চ জলপাইগুড়িতে,** গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। **গণ উদ্যোগ হারিয়ে গেল ?** দেবপ্রসাদ রায়। **যে শহর আমার মনে মনে,** বিজয় দে। **উত্তরের বাগানে,** তনুশ্রী পাল। **জলপাইগুড়ি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী,** সংকলন রণজিৎ কুমার মিত্র।

হার্ডবোর্ড বাঁধাই রঙ্গীন ছবিতে মোড়া এই বইয়ের দাম ৩০০ টাকা

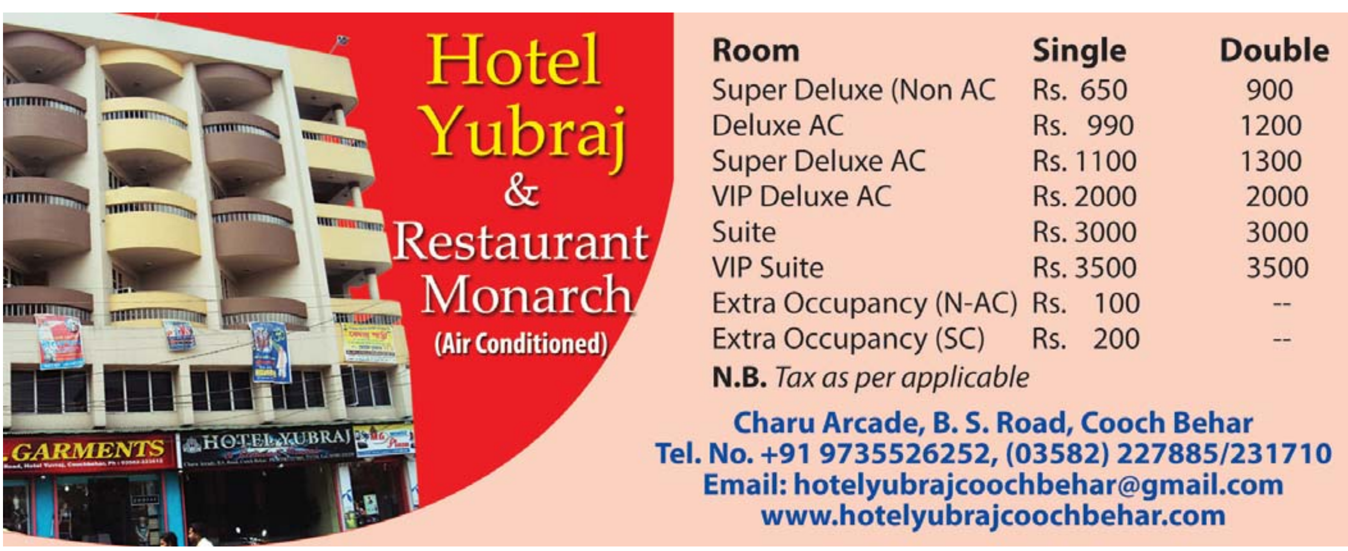

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.